দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

তৃতীয় বর্ষ ❖ ৯ সংখ্যা ❖ ১৭সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা নাগ (রায়)

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

অমিতার্থনীতি

● জিডিপির পরিসংখ্যান — অমিত দাশগুপ্ত — ৩

প্রবন্ধ

● জিডিপি বৃদ্ধির হার এত বেশি তাও দেশের মানুষের আর্থিক দুর্গতি — সৌর বসু — ৫

আন্তর্জাতিক

● দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বড় অপরাধ — নওসাদ সিদ্দিক — ৭

● ব্রিকস সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী: মিলিত হলেন রাহুল গান্ধির সাথে, গান গাইলেন নৈশভোজে — শুভাশিস মজুমদার — ৯

● হিন্দু গোষ্ঠীর পরিদর্শনের সময় নারী কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট, আইফেল টাওয়ার বন্ধ — ৯

পরিবেশ ও প্রকৃতি

● এলোমেলো কথা
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা : প্রকৃতি ও মানুষ — শুভ বসু — ১১

জাতীয় সংবাদ

● ন্যারেটিভ থেকে নকল — পার্থ প্রতিম বিশ্বাস — ১২

● ইসরোর বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব নয়টি কর্মচারী সংগঠন — ১৪

● উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ — ১৪

● বাংলার মেয়ে আকৃতি চৌধুরীর মুক্তি, জেলা শাসকের জরিমানা — ১৫

● প্রকাশিত হচ্ছে সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা — শুভাশিস মজুমদার — ১৬

নাগরিক স্মৃতিচারণা

● স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেত্রী লীলা নাগ (রায়) — ১৬

রাজ্য সংবাদ

● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন প্রশাসন সংশোধনী বিল আনা হল — অমিতাভ সিংহ — ১৮

● পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সংকট কাটছে না — মজিবুর রহমান — ১৯

● দেশে খাদ্যাভ্যাস বদলে হিন্দুত্ববাদী অপচেষ্টা ! — উদ্দালোক শর্মা — ২১

স্মরণ

● কেতকী কুশারী ডাইসন — ২১

● বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক সুরেশ কুন্ডু — ২২

● প্রাক্তন শিক্ষক নেতা (বিপিটিএ) কৃষ্ণ দাস — ২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

● বন্ধুতার পাতা সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন ও নাগরিকদের প্রশ্ন করার অধিকার

রাজ্যে বিজেপি সরকার তাদের কার্যকালের চার মাস সম্পূর্ণ করেছে। নির্বাচনের আগে এই দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলা হয়েছিল , তাঁরা ক্ষমতায় এলে জনজীবন থেকে ভয় চলে যাবে , আর ভরসা ফিরে আসবে। শহর ও গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। বলা হয়েছিল যারা লক্ষীর ভান্ডার পান তারা সকলেই অন্নপূর্ণার ভান্ডার বাবদ ৩০০০ টাকা পাবেন । প্রকৃতপক্ষে নানা শর্ত আরোপিত হওয়ায় প্রায় ১ কোটি মহিলা এখনও অন্নপূর্ণা ভান্ডার পায় নি।এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে ।

মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ রোজগার যোজনায় বছরে ১০০ দিন কাজ পাওয়ার গ্যারান্টি ছিলো ।এই প্রকল্পের নাম পাল্টে করা হয় ভিবিজি রাম জি প্রকল্প ।বলা হয় ১২৫ দিন কাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রকল্প কার্যত নন স্টার্টার । বাজেট কমানো হয়েছে । অথচ এই গ্রামীণ রোজগার যোজনাটির মাধ্যমে ইউপিএ সরকারের আমলে বিরাট সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্য সীমার ওপরে নিয়ে আসা হয়েছিল ।

রোজই প্রায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জবরদস্তি তোলা আদায়ের সংবাদ আসছে ।শাসক দলের রাজ্য সভাপতি প্রায়ই বলছেন এরা দলের কেউ নয় ।এদের সম্পর্কে জিরো টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ।ইতি মধ্যেই থানা লকআপ -এ দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।একাধিক পাশবিক ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বারুইপুরে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় একজন অভিযুক্তকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের নামে এনকাউন্টার করে মারা হয়েছে ।

সব চাইতে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকে।ওই ব্লকের কারিশুন্ডি গ্রামের আব্দুল হাফিজ 'নিজের স্কুল ঠিক কর' কর্মসূচি অনুযায়ী নিজের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে খোঁজ নেন।আব্দুলকে কয়েকজন সমাজবিরোধী তাঁর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করে।তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মফিক বাধা দিতে গেলে মারাত্মক ভাবে আহত হন।পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল ও তাঁর মা সরকারের ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন ওই টাকা দিয়ে গ্রামে একটি ভালো স্কুল করা হোক।আব্দুল 'সিটিজেনস ফর পিস এন্ড জাস্টিস' এর সদস্য। সে উপরোক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী নিজের গ্রামের স্কুলের খোঁজ নিতে গিয়েছিল ।

রাজ্যে পুর্বতন সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি, বহু বিদ্যালয়ে অসংখ্য শিক্ষক পদ শূন্য, পরিকাঠামো জরাজীর্ণ, ৮০০০ বিদ্যালয় বন্ধ । এই বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন ছিলো শূন্যপদে নিয়োগ , পরিকাঠামো সংস্কার , বন্ধ বিদ্যালয় খোলা, ক্লাসরুম টিচিং এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া ।এই বিষয়গুলি সম্পর্কে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে ইতিহাসের পাঠক্রম পরিবর্তনের ওপর । পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের সিলেবাসে অনেক বদল ঘটতে চলেছে। দলীয় ধারণার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত আখ্যান নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন করে কাউকে 'হিরো' অথবা কাউকে 'ভিলেন' বানানো হবে। সাহিত্যের মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িকতায় শান দেওয়া হবে। বিজ্ঞানের যে অধ্যায়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘাত আছে, সেই অধ্যায় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়বে। শিক্ষার্থীরা যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বদলে বিশ্বাসনির্ভর শিক্ষা লাভ করবে। সরকার একদিকে বলছে 'মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' মাদ্রাসা তুলে দেওয়া হবে; অন্যদিকে 'হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বিদ্যাভারতী বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা ঘোষণা করছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনও সরকার কি এমন পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপ করতে পারে ? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পাঠক্রম ধর্মভিত্তিক হওয়া কখনই উচিত নয়।

ইতিহাসের নব নব ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের পূর্বসূরীদের কোনও সম্পর্ক ছিলনা , যাঁরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তাঁদের উত্তরসূরীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকৃত ইতিহাস লিখছে। মুক্ত চিন্তার অনুশীলন , প্রশ্ন করার অধিকার বর্তমান শাসকদের একেবারেই নাপছন্দ । সেই কারণেই বর্তমান সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর খিপ্ত ।

'মুক্ত কর প্যালেস্টাইন এই সব স্লোগান যারা দেয় তাদের উপরে ফেলবেন' বলে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যে প্যালেস্টাইনের ওপর এত ক্রুদ্ধ তিনি কি জানেন না যে সদ্য অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে সার্বভৌম প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠার ডাক দেওয়া হয়েছে ।এই আহ্বানের শরিক ভারত।আমাদের দেশ ওই ভূমির জনগণের স্বাধীনতার দাবিকে ১৯৪৭ সাল থেকে সমর্থন করছে ।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন কথা বলবেন তখন কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন না ? দেশের গৃহীত বিদেশ নীতির পরিপন্থী অবস্থান নেবেন ?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামী প্রণবানন্দের মাটি এই পশ্চিমবঙ্গ। আধ্যাত্মিক জাগরণের এই ভূমিতে গেরুয়া নিয়ে কোনও অসন্মানজনক উক্তি করা বা লেখার আগে পাঁচবার ভাবতে হবে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্র ও অধ্যাপক গেরুয়া বর্ণ কে অসন্মান করেছেন নাকি ? তাঁরা জানেন , গেরুয়া বর্ণ ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক। আমাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার একটি বর্ণ। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাজনৈতিক সভায় গেরুয়া বসন শোভিত সাধু ও নাগা সন্নাসীদের উপস্থিতি কি তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে ।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একটি বিল পাস করিয়েছেন।উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীদের অন্যত্র বদলি করার ক্ষমতা করায়ত্ত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ও গবেষণার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই বিল পাস করা হয়নি তা শাসক দল জানে।

আমাদের সংবিধান নাগরিককে প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছে। প্রশ্ন করার অধিকার ছাত্রদেরও আছে।এই কথা দেশকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় উজ্জ্বল ভুঁইয়া।এ তাঁর নিজস্ব মতামত নয় । সংবিধানে তা লিপিবদ্ধ আছে। গণতন্ত্রে সরকারের কর্তব্য নাগরিকদের এই অধিকার রক্ষা করা।পুলিশ কখন নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে আইনে সে নির্দেশও দেওয়া আছে ।পুলিশ যখন এই অধিকার লঙ্ঘন করে তখন তাঁরা পেশাদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। বিচারপতি ভুঁইয়া এই সত্যটি আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ।

অমিতার্থনীতি

জিডিপির পরিসংখ্যান:‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে’

অমিত দাশগুপ্ত

এদেশের জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) নিয়ে ধন্ধের ট্রাডিশন চলছেই, গত বারো বছর ধরে। তিন মাস বাদে একবার সেই ত্রৈমাসিক তথ্য পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী যে অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, অর্থসচিবের থেকে এনটায়ার অর্থনীতিতে অনেক বেশি দক্ষ, তা আমরা বুঝতে পারি ; তিনি জনসমক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অতি উত্তম জানিয়ে ভাষণ দেন, যার ফলে দেশের জনসাধারণ বুঝতে পারেন যে, গত তিনমাসে তাঁরা আর্থিক ভাবে আগের থেকে অনেক সচ্ছল হয়েছেন, যেটা তাঁরা ওনার ভাষণের আগে বুঝতেই পারেননি। জটিল অঙ্ক যেমন ছাত্রী - ছাত্ররা শিক্ষক মহাশয় না বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারে না, তেমনি তাঁরা যে ভালো আছেন তা প্রধানমন্ত্রী না বলে দিলে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা অনুভব করতে পারছিলেন না। তিনি বলার পরে বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম থেকে হোয়াটসঅ্যাপ সর্বত্র খুশির ফোয়ারা বইয়ে দেওয়া হয়। এটা গত ১২ বছরে হয়েই চলেছে। ওই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অ্যাঙ্কর বা হোয়াটসঅ্যাপ বিবি-বাবুদের অধিকাংশই জিডিপি বলতে ঠিক কী বোঝায় জানেন না, প্রধানমন্ত্রীও সঠিক জানেন কিনা তা বলতে পারব না। জটিল এক পরিমাপ না জানাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অজ্ঞতা ভক্তবৃন্দের ফুর্তিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

গত ৩১ আগস্ট তেমন এক ত্রৈমাসিক তথ্য পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। পরে পরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্সটাগ্রামে দেশের সকল সমালোচকদের মুখে ২০২৬-২৭ এর প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি পরিসংখ্যান এক প্রবল থাপ্পর মেরেছে বলে ভাষণ দেন। কারণ হল, গত এপ্রিল-জুন তিন মাসের উপসাগরীয় যুদ্ধের বিধ্বংসী পরিস্থিতিতেও দেশের জিডিপি তার আগের বছরের ওই সময়ের জিডিপির তুলনায় ৭.৮ শতাংশ বেড়েছে। আবারো ভক্তবৃন্দ দলে দলে নাম সঙ্কীর্তন করতে নেমে পড়েছেন। ওদিকে মোদি সরকারের পূর্বতন অর্থসচিব শ্রী সুভাষচন্দ্র গর্গ জিডিপির বৃদ্ধির হার নিয়ে টিপ্পনি কেটেছেন। তিনি বলেছেন বাস্তবে জিডিপি বাড়েইনি। মনে রাখতে হবে, ইনি মোটামুটি মোদি সরকারের পেয়ারের আমলা ছিলেন। ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন, তারপরে ২০১৯ সালের জুলাই মাস অবধি ভারত সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিভাগের সচিব, ও সঙ্গে ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে ওই জুলাই অবধি অর্থসচিব ছিলেন। এমন এক ব্লু-আইড বয় কেন বিগড়ে গেলেন,সেটাও প্রশ্ন।

জানিয়ে রাখি, কোনো ত্রৈমাসিকের জিডিপিকে প্রথমে সেই সময়ের মূল্যে মাপা হয়। যেহেতু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে, তাই মূল্যবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত সামঞ্জস্য সাধন করে বাস্তব জিডিপি পরিমাপ করা হয়। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি ২০২৫-২৬ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ৯০ হাজার টাকা আয় করেছিলেন, এবং ২০২৬-২৭ সালের ওই তিন মাসে ৯৯ হাজার টাকা আয় করেছেন। সাধারণ হিসেবে তাঁর আয় (৯৯-৯০)/৯০ শতাংশ গু ১০ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু ওই একবছরে যদি গড় মূল্যবৃদ্ধি ৬ শতাংশ হয় তাহলে বাস্তবে তার আয় ১০-৬ গু ৪ শতাংশ বেড়েছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ৯০ হাজার টাকা আয়কে ও ২০২৬-২৭ সালের ওই তিন মাসে ৯৯ হাজার টাকা আয়কে চলতি মূল্য বা নমিনাল আয় বলা হবে। দেশের ক্ষেত্রে নমিনাল জিডিপি বলা হয়ে থাকে।

৩১ আগস্ট প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে ২০২৬-২৭ ও ২০২৫-২৬ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে নমিনাল জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৮০ লক্ষ কোটি ও ৮৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে নমিনাল জিডিপি বেড়েছে, (৮৮.২৭-৮০)/৮০ গু ১০.৩ শতাংশ। সরকারের কথা অনুযায়ী, ওই এক বছরে জিনিসপত্তরের দাম বেড়েছে ২.৫ শতাংশ। ফলে জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০.৩-২.৫ গু ৭.৮ শতাংশ। এই পর্যন্ত অঙ্ক মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুভাষবাবু একটি সঙ্গত (সঠিক নাও হতে পারে) প্রশ্ন তুলেছেন। ২০২৫-২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)-এর চলতি মূল্যে জিডিপিকে ৬ লক্ষ কোটি টাকা কমানো হল কেন? কেন না, ২০২৫ সালের ৩১ আগস্টে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ওই ত্রৈমাসিকের নমিনাল জিডিপি ছিল ৮৬.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। তখনো বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। তাহলে এখন তা কমে ৮০ লক্ষ দেখানো হচ্ছে কেন?

যদি ওই সংখ্যাকে পূর্বতন অবস্থায় ধরে রাখা হয় তাহলে নমিনাল জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায়, (৮৮.২৭-৮৬.০৫)/৮৬.০৫ গু ২.৬ শতাংশ, যার থেকে সরকার ঘোষিত মূল্যবৃদ্ধির হার (২.৫ শতাংশ)-কে বাদ দিলে বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় .১ শতাংশ, যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। সুভাষবাবুর কথায় নমিনাল জিডিপি অতটা কমে কী করে ? যদিও তা তাৎক্ষণিক অনুমান, যা পরে কিছুটা

বাড়ে কমে, কিন্তু অতটা কমবে কেন? যেমন ব্যক্তির আয়, আমাদের উদাহরণে, ২০২৫-২৬-এ ৯০ হাজার টাকা ছিল, তা তেমন বাড়বে কমবে না। সুভাষবাবুর কথায় আপাত যুক্তি আছে। কিন্তু সরকারের তরফে যুক্তি হল যে, আগে ২০১১-১২ সালের প্রচলিত বন্দোবস্ত অনুসরণ করে নমিনাল জিডিপি ও বাস্তব জিডিপি মাপা হয়েছিল, পরে ২০২২-২৩ সালের উন্নত বন্দোবস্তে তা মাপা হয়েছে। এই ধরণের পরিবর্তনকে ভিত্তি বৎসর পরিবর্তন বলা হয়।

সরকারের কথায় ওই ২০২২-২৩ সালের বন্দোবস্তে ২০২৫-২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের নমিনাল জিডিপি পাল্টে ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২৬ এ ৮০.৩২ লাখ কোটি, তারপরে জুন ২০২৬-এ ৮০.৪৪ লাখ কোটি টাকা হয়েছিল। সেটি সবশেষে কমে ৮০ লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ভিত্তি বৎসর পাল্টালে, সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির হারে বেশ খানিক পরিবর্তন হয়, তাই বাস্তব জিডিপি বেশ খানিক পাল্টায়। কিন্তু নমিনাল জিডিপি যেহেতু টাকার অঙ্কে মাপা হয় তাই তা পাল্টালেও তেমন পাল্টায় না।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকের বৃদ্ধি হিসেব করায় পুরোনো বন্দোবস্তে হিসেব করা বিগত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের নমিনাল জিডিপি ৭ শতাংশ কমে গেছে, নতুন বন্দোবস্তে, যা বেশ সন্দেহজনক। সেই সন্দেহের দিক থেকে সুভাষবাবুর বক্তব্য যথেষ্ট সঙ্গত। কিন্তু ২০২২-২৩ ভিত্তিবর্ষের ভিত্তিতে হিসেব করা ২০২৬-২৭ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের নমিনাল জিডিপিকে ২০১১-১২ ভিত্তি বর্ষের ভিত্তিতে হিসেব করা ২০২৫-২৬ সালের নমিনাল জিডিপির নিরিখে তুলনা করে নমিনাল জিডিপি বৃদ্ধির হার নিরূপণ অবশ্যই সঠিক নয়। দুটির তুলনা সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়।

তাহলে নমিনাল জিডিপির বৃদ্ধির হার কত? যেহেতু সব কিছু ঘেঁটে 'ঘ' করে দেওয়া হয়েছে তাই সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। অপরদিকে সরকার বাহাদুরের আমলাগণ আরেকটি উল্লেখযোগ্য হিসেব করেছেন; আলোচ্য সময়ে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৯ %, পাইকারি মূল্য বৃদ্ধির হার ৯.৪%। ফলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.৯ % কম হবে না। কিন্তু নমিনাল জিডিপি বৃদ্ধির হারের থেকে মূল্যবৃদ্ধির হারের জন্য মাত্র ২.৫ % বাদ দেওয়া হয়েছে বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির হারে পৌঁছতে।

এই সব হিসেব নিকেশের 'কারচুপি' থেকে এটা বলা যায় যে, সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনাটি ক্রমাগত বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। মনে রাখা দরকার সরকারের পছন্দ না হলে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় না, যেমনটা করা হয়েছিল ২০১৯ নির্বাচনের আগে। ২০১৭-১৮ সালের শ্রমশক্তি সমীক্ষা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ সালের উপভোক্তা ব্যয় সমীক্ষার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ সেগুলি সরকারের পক্ষে উপাদেয় ছিল না। ফলে ২০১১-১২ সালের পরে সেই গুরুত্বপূর্ণ উপভোক্তা ব্যয় সমীক্ষা বছর খানেক আগে প্রকাশিত হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালের সমীক্ষা হিসেবে। যেমন তৎকালীন পরিসংখ্যান কমিশন যখন ২০১১-১২ ভিত্তি বর্ষের নিরিখে আগের বছরগুলির জিডিপি বৃদ্ধির হিসেব করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যেখানে কংগ্রেস আমলের জিডিপি বৃদ্ধির হার বিজেপি আমলের বৃদ্ধির হার থেকে বেশি দেখা যায়, তখন মোদি সরকার তা অস্বীকার করে, ও নিতি আয়োগ নতুন করে হিসেব করে বিপরীতটা দেখালে মোদিজির শান্তি হয়; যদিও ওই পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব ও পরিপক্কতা পরিসংখ্যান কমিশনের।

পরিসংখ্যান কমিশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে সরকার বাহাদুর নিজ পছন্দের কমিশন বানিয়েছে। পুরো সরকারি পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ভারতের পরিসংখ্যানকে 'সি' শ্রেণিতে ঠেলে দিয়েছে, যার অর্থ, তথ্যের মধ্যে এমন কিছু পদ্ধতিগত ও কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, যা নির্ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছে। মোদি সরকারের পূর্বতন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াম বহুকাল আগে থেকেই মোদি সরকারের জিডিপি বৃদ্ধির হারকে বাড়িয়ে দেখানোর কথা বলছেন। তাঁর কথায় সরকার বৃদ্ধির হারকে ক্রমাগত ১.৫-২ শতাংশ বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। এবিষয়ে পিটারসন ইন্সটিট্যুট ফর ইন্টারন্যাশনলা এফেয়ার্সের ওয়ার্কিং পেপার হিসেবে অভিষেক আনন্দ, জোস ফেলম্যান এবং অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়ামের 'ইণ্ডিয়া'স টুয়েন্টি ইয়ারস অফ জিডিপি মিসএস্টিমেশন : নিউ এভিডেন্স' শীর্ষক একটি নিবন্ধ এবছরের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের কথায় ২০০৫-২০১১ পর্যন্ত জিডিপি বৃদ্ধির হারকে ১-১.৫ শতাংশ কমিয়ে দেখানো হয়েছে, এবং ২০১২-২০২৩ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধির হারকে ১.৫-২ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'টেস্ট অফ দি পুডিং ইজ ইন ইটিং'; অর্থাৎ রান্না কেমন হয়েছে তা ভোক্তা খেয়ে তবে বুঝবে। জিডিপির ৭.৮ % বৃদ্ধি যদি দারুণ হয়ে থাকে তাহলে সেটা দেশের আমজনতার অনুভবে আসবে যদি বেকারির হার কমে, পণ্যের প্রাপ্যতা বাড়ে, দাম না বাড়ে, ট্রেনের টিকেট সহজলভ্য হয়, রাস্তাঘাট মসৃণ হয়, জনতা ঋণমুক্ত হয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মুনাফা বাড়ে, কৃষি মজুরের বাস্তব মজুরি বাড়ে, শ্রমিকের বাস্তব মজুরি বৃদ্ধি পায়, কৃষক তার পণ্যের লাভজনক দাম পায়, শিশু থেকে যুবক বিনামুল্যে ভালো

শিক্ষা পায়, রুগী বিনামূল্যে উত্তম স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়। এগুলি কি হয়েছে? নীতি আয়োগের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৯.২ কোটি যুবক সম্পূর্ণ বেকার, অর্থাৎ তারা শিক্ষারত, চাকুরিরত বা প্রশিক্ষণরত কোনোটাই নয়। ওই তথ্য অনুযায়ী ভারতের স্নাতকদের মধ্যে কেবল ৮.২৫ শতাংশ তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করছেন, বাকি ৯১.৭৫ শতাংশ হয় নিম্নস্তরের কাজে নিযুক্ত বা বেকার। তথ্য অনুযায়ী, সোনা বন্ধক দিয়ে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান, ঋণ খেলাপের পরিমাণ বাড়ছে খুচরো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেও। পণ্য মূল্যও যথেষ্ট বাড়ছে। এরকম বহু সূচককে যদি জিডিপির বৃদ্ধির প্রক্সি (মানে যেহেতু জিডিপি'র বৃদ্ধির হারকে সরকার গুলিয়ে দিয়েছে তাই অন্য কিছুর নিরিখে দেশের অর্থনীতির হাল বোঝা) হিসেবে ধরা যায়, তাহলে বোঝা যাবে জিডিপির বৃদ্ধির হারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোটাই রীতি হয়ে উঠেছে; নাহলে দেশের অর্থনীতি চাঙা বলে ঢাক পেটানোর সঙ্গে মোদিজি সোনা না-কেনার ও বিদেশে না-যাওয়ার ফরমান (বিদেশে বসে) দেবেন কেন ?

দুটি বিষয়ের দিকে পাঠকের চোখ টানতেই হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি বৃদ্ধির হার দেখছিলাম। মনে রাখা দরকার ওই সময় মার্কিন দেশে গৃহঋণের বুদবুদ ফেটে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। সেই ত্রৈমাসিকেও বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ % (কোনো ভিত্তি বর্ষ না পাল্টেই, এবং যে সময়ের বৃদ্ধির হারকে ১-১.৫ % কম দেখানো হয়েছে বলে অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াম মনে করেন)। যে সংবাদ তৎকালিন ইউপিএ সরকারের তরফে প্রকাশ হয়েছিল তা ছিল সাদামাটা, কোনো ঢাক পেটানো ছিল না। তখন জিডিপি নিয়ে হৈচৈ করার রীতি ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয়টি খানিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যা দেশের উপরতলার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও নীতিনির্ধারকদের অকর্মণ্যতা বা অযোগ্যতার দিকে ইঙ্গিত করবে। শ্রী সুভাষচন্দ্র গর্গ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা কাকতালীয় ভাবে প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে। কিন্তু একজন আইএমএফ-এর প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, সরকারের অর্থ সচিব জানেন না যে, দুটি ভিন্ন ভিত্তি বর্ষের নমিনাল জিডিপির তুলনা করা যায় না? কারা তাহলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, কাদের মোদি সরকার সেই সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে, কাদের স্বার্থে করে?

(অমিত দাশগুপ্ত অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এখন থেকে প্রতি মাসে 'নাগরিক' - এর পাতায় একটি করে নিবন্ধ লিখবেন।)

প্রবন্ধ

ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার এত বেশি তাও দেশের মানুষের আর্থিক দুর্গতি কেন

সৌর বসু

আমরা সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরেছি আট-নয় দিন হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকার একটি ভ্রমণ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ খুবই অতিথিবৎসল ও নম্র প্রকৃতির। জাভা, সুমাত্রা এবং বালি;এই তিনটি দ্বীপে আমরা কিছুটা সময় কাটিয়েছি। প্রায় ১৭ হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশটি সম্পর্কে ভ্রমণের আগে আমাদের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক মুসলমান ধর্মাবলম্বীর বসবাস ইন্দোনেশিয়ায়। অথচ দেশটি পরিভ্রমণকালে ধর্মের কোনো বিশেষ বাহ্যিক প্রকাশ আমাদের চোখে পড়েনি। ওলন্দাজরা দীর্ঘদিন ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারই নিদর্শন হিসেবে অনেক গির্জা চোখে পড়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য মসজিদের উপস্থিতিও আমাদের চমৎকৃত করেছে। আরও বিস্মিত হয়েছি ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখে। এই দেশের মানুষের মনের গভীরে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি প্রোথিত।

আমাদের দেশের প্রায় সমসাময়িক সময়ে;১৯৪৫ সালে;ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে দেশটি একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০২৬ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ইন্দোনেশিয়ার মাথাপিছু নামমাত্র জিডিপি প্রায় ৫,৩৬২ মার্কিন ডলার। স্বাভাবিকভাবেই তুলনাটা এসে পড়ে আমাদের দেশের সঙ্গে, কারণ দুটি দেশই প্রায় একই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বর্তমানে মাথাপিছু নামমাত্র জিডিপি প্রায় ২,৮১৩ মার্কিন ডলার। ভারত বর্তমানে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত।

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ। জিডিপির এই প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কথা উপস্থাপন করছি। এই চমকপ্রদ তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষ গর্গ। তাঁর মতে, জিডিপি বৃদ্ধির এই সংখ্যাগুলিকে

ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি মাত্র ২.৬ শতাংশ। একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি এই বক্তব্য তুলে ধরার পর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বাস্তবিকপক্ষে, পরিসংখ্যানগত তথ্যের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এক দশক ধরে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের আর্থিক উন্নতির জয়গান করা হচ্ছে;এমন অভিযোগ অনেক অর্থনীতিবিদ করেছেন। তাঁদের মতে, মোদি সরকার যে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ছবি তুলে ধরছে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক রয়েছে।

এছাড়া, বেশ কিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনে করেন, মোদি সরকারের কিছু ভুল অর্থনৈতিক নীতির ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ২০১৬ সালের নোটবন্দির ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরের বছর, ২০১৭ সালে, তড়িঘড়ি করে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) চালু করতে গিয়েও নানা জটিলতা ও ভুলভ্রান্তি দেখা দেয়। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারি এবং লকডাউনের সময়ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু ছোট ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান বিপদের সম্মুখীন হয়।

এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অরুণ কুমারের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, মোদি সরকারের কিছু ভুল অর্থনৈতিক নীতির ফলে যেখানে কোনো বিশেষ বিশৃঙ্খলা ছিল না, সেখানেও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনীতির দুর্বলতাকে আড়াল করতে গিয়ে তথ্যের অসঙ্গতি ঘটিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের একটি উজ্জ্বল ছবি আঁকতে চাইছে;এমন অভিযোগও উঠেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন অবশ্য এই ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারকে সরাসরি অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর মনে কতকগুলি সংশয় দেখা দিয়েছে এবং তিনি সেই সংশয় থেকেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হল;আমাদের দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার যদি এত বেশি হয়, তাহলে সেই অনুপাতে ভালো চাকরি তৈরি হচ্ছে না কেন? দেশের শিল্পপতিরা বিনিয়োগে উৎসাহ পাচ্ছেন না কেন? বিদেশি বিনিয়োগও কেন প্রত্যাশিত মাত্রায় আসছে না? রঘুরাম রাজন আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের বিপুল জনসংখ্যা এবং বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য যদি পর্যাপ্ত ও ভালো মানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হয়,দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে;এই প্রশ্নই তাঁর উদ্বেগের কেন্দ্রে রয়েছে।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিতর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল;কী পদ্ধতিতে জিডিপি পরিমাপ করা হচ্ছে, অর্থাৎ এর মেথডোলজি বা পরিমাপ-পদ্ধতি। মোদি সরকারের প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. অরবিন্দ সুবহ্মনিয়ামের মতে, ২০১৫ সালের পর তিনটি বড় অর্থনৈতিক ধাক্কায় অসংগঠিত ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;নোটবন্দি, পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) এবং কোভিড-১৯ মহামারি ও লকডাউন।

নোটবন্দি অসংগঠিত ক্ষেত্রকে বড় ধরনের ধাক্কা দেয়। এরপর GST চালু হওয়ার ফলে বহু নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান করব্যবস্থার আওতায় আসে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে GST কার্যকর করতে গিয়ে পুরনো ও নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা দেখা দেয়। কোভিড মহামারি ও লকডাউনও ছোট ও অসংগঠিত বহু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে।

এর ফলে জিডিপি পরিমাপের সময় অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন সম্পর্কে যথাযথ তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনের একটি 'প্রক্সি' বা পরোক্ষ সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানেই নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, সংগঠিত ক্ষেত্রের গতিবিধি সব সময় অসংগঠিত ক্ষেত্রের গতিবিধিকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে না। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রকৃত উৎপাদন ও আয়ের পরিবর্তন জিডিপির হিসাবের মধ্যে কতটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্কের মূল কেন্দ্র তাই এই 'প্রক্সি' পরিসংখ্যান। অর্থনীতিবিদদের একাংশের অভিযোগ, প্রকৃত উৎপাদনের তথ্যের পরিবর্তে পরোক্ষ বা প্রক্সি তথ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে জিডিপি বৃদ্ধির হার বাস্তবের তুলনায় বেশি দেখাতে পারে।

অন্যদিকে, দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি, পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং অন্যান্য দুর্বলতার সঙ্গে জিডিপির এত উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে যে অসংগতি দেখা যাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অতএব, বিতর্কটি শুধু ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার সত্য না মিথ্যা;এই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। আসল প্রশ্ন হল, এই প্রবৃদ্ধির হিসাব দেশের মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার কতটা প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। যদি জিডিপি বাড়ে, অথচ সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি না ঘটে, তাহলে সেই উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

ইন্দোনেশিয়া সফর থেকে ফিরে তাই একটি প্রশ্ন বারবার মনে আসছে;প্রায় একই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করা দুটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এত ফারাক কেনো ? আর ভারতের জিডিপি যদি সত্যিই এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা পৌঁছচ্ছে ?

আন্তর্জাতিক

দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ !

নওসাদ সিদ্দিক

একজন বন্দি মানুষ তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকা মাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। মা মারা যাওয়ার পর তাঁকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হল;শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য। এই ঘটনা আজকের দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি নির্মম প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে আটক হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মা সন্ধ্যা রানি ধর সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সেই সুযোগ তাঁর হয়নি। মৃত্যুর পর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্যারোলে শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু বিচারাধীন একজন মানুষকে মানবিক মর্যাদা দেওয়াটা কি উচিত ছিল না ? মনে রাখতে হবে, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে একজন মানুষ ।আর মানবাধিকার সেই মানুষের মৌলিক অধিকার।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি কেবল তার পুলিশ, কারাগার বা ফৌজদারি আইনের কঠোরতায় নয়। তার প্রকৃত শক্তি প্রকাশ পায়;সে কতটা মানবিকভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে তাতে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের ঘটনাটি তাই শুধু বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন নয়। এটি বন্দির অধিকার, due process এবং রাষ্ট্রের মানবিক বিবেচনার প্রশ্ন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে ভারত থেকে প্রতিবাদ হয়। হওয়াই উচিত। বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু একই নৈতিক মানদণ্ড যদি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে মানবাধিকার রক্ষা নয়;আমরা কেবল ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে মানবাধিকারের ব্যবহার করছি।

Freedom House-এর Freedom in the World ২০২৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে ৪৪ পেয়ে ‘আংশিক স্বাধীন’ এবং ভারত ৬২ পেয়ে একইভাবে ‘আংশিক স্বাধীন’ শ্রেণিতে রয়েছে। অর্থাৎ দুটি দেশই এমন গণতন্ত্র, যেখানে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ রয়েছে।

আর World Justice Project এর ২০২৫ Rule of Law Index-এ ভারতের স্থান ১৪৩টি দেশের মধ্যে ৮৬তম, স্কোর ০.৪৯-এর কাছাকাছি। ২০২৪ সালের ৭৯তম স্থান থেকে ভারতের অবস্থান ২০২৫-এ ৮৬তম হয়েছে। আরও অস্বস্তিকর তথ্য রয়েছে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে। Reporters Without Borders-এর ২০২৬ World Press Freedom Index-এ ভারতের অবস্থান ১৫৭তম/১৮০, স্কোর ৩১.৯৬।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ২০২৬ সালের USCIRF Annual Report ভারতকে “Country of Particular Concern” হিসেবে সুপারিশ করেছে এবং ২০২৫ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আইন ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করা যেমন জরুরি, তেমনই ভারতের ক্ষেত্রেও একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা জরুরি।

এই প্রশ্নটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে শারজিল ইমাম ও উমর খালিদের ক্ষেত্রে। শারজিল ইমাম ২০২০ সালের জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন। উমর খালিদ গ্রেপ্তার হন ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরেও তাঁরা ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা-সংক্রান্ত বৃহত্তর ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দি। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের জামিন প্রত্যাখ্যান করেছিল; পরবর্তীতে জুলাই ২০২৬-এ দিল্লির একটি আদালতও তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ করে। এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা দরকার;বিচারাধীন বন্দি মানে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নয়।

রাষ্ট্রের অভিযোগ গুরুতর হতে পারে। রাষ্ট্রের কাছে তদন্তের যুক্তি থাকতে পারে। আদালত জামিন নাকচ করতেই পারে। কিন্তু একজন মানুষ বছরের পর বছর বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে থাকলে প্রশ্ন উঠবেই;বিচার কি শাস্তির বিকল্প হয়ে যাচ্ছে ?

শারজিল ইমামের ক্ষেত্রে ২০২০ থেকে ২০২৬;ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন আটক; উমর খালিদের ক্ষেত্রেও প্রায় ছয় বছর। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত

ব্যক্তির সঙ্গে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ICCPR-এর আর্টিকেল ১০ বিশেষভাবে বন্দিদের মানবিক আচরণ ও তাদের অন্তর্নিহিত মর্যাদা রক্ষার কথা বলে। ভারত ১৯৭৯ সাল থেকেই ICCPR-এর সদস্যরাষ্ট্র; বাংলাদেশ ২০০০ সালে ICCPR-এ যোগ দেয়। অর্থাৎ মানবাধিকার নিয়ে এই দুই রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রয়েছে।

আমার এই আলোচনায় ফাদার স্ট্যান স্বামীর নাম বাদ রাখতে পারি না। আদিবাসী অধিকারকর্মী ও জেসুইট পুরোহিত স্ট্যান স্বামীকে ২০২০ সালে UAPA-র অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৩ বছর এবং তিনি পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জামিনের আবেদন বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়। কারাগারে তাঁর চিকিৎসা ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিয়েও গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের ৫ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাগারে মারা যাননি। তিনি বিচারাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ। সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার নামে যদি এমন একজন বৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ মানুষও পর্যাপ্ত মানবিক বিবেচনা থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে প্রশ্ন উঠবে;আইন কি ন্যায়বিচারের হাতিয়ার, নাকি কখনও কখনও রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণের মাধ্যম হয়ে উঠছে?

বাংলাদেশে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁর মাকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে পারলেন না। ভারতে মুসলিম ছাত্র-অ্যাক্টিভিস্ট বছরের পর বছর বিচারাধীন বন্দি। আরেকজন রাজনৈতিক কর্মীও একইভাবে দীর্ঘ বিচার-পূর্ব কারাবাসের মধ্যে রয়েছেন। একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান যাজক ও আদিবাসী অধিকারকর্মী কারাগারে থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

এই ঘটনাগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলাদা অভিযোগ আলাদা। রাষ্ট্রের যুক্তি আলাদা। কিন্তু একটি সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে : রাষ্ট্র কি অভিযুক্ত ব্যক্তির মানবিক মর্যাদাকে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের উর্ধ্বে রাখতে পারছে?

এখানেই দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার সংকট।

২০২৬ ডেমোক্রেটিক রিপোর্টও বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ এবং কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা নিয়ে সতর্ক করেছে। তাদের গবেষণা গণতন্ত্রকে শুধু নির্বাচন দিয়ে বিচার করে না; liberal–participatory– deliberative, egalitarian dimensions-সহ বহুমাত্রিক কাঠামোয় গণতন্ত্রকে পরিমাপ করে।

ফলে একটি দেশ নিয়মিত নির্বাচন করলেই তার গণতন্ত্র সম্পূর্ণ হয় না। প্রশ্ন হল;বিরোধী কণ্ঠ কতটা নিরাপদ? সংখ্যালঘু কতটা নিরাপদ? বন্দি কতটা মর্যাদা পান? সাংবাদিক কতটা স্বাধীন? আদালত কতটা স্বাধীনভাবে নির্বাহী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

World Justice Projecté-এর ২০২৫ রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী আইনী শাসনের ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং নাগরিকের স্থান সংকোচনের কথা বলা হয়েছে। ১৪৩টি দেশের মধ্যে ৬৮ শতাংশ দেশেই আইনের শাসন আগের বছরের তুলনায় দুর্বল হয়েছে।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে কেউ বলতে পারেন;'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

শারজিল ইমাম বা উমর খালিদের দীর্ঘ বিচারাধীন কারাবাস নিয়ে প্রশ্ন তুললে অন্য কেউ বলতে পারেন;'ভারতের নিরাপত্তার বিষয়।'

ফাদার স্ট্যান স্বামীর প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে;'তিনি গুরুতর অভিযোগের মুখে ছিলেন।'

কিন্তু মানবাধিকারের যুক্তির সঙ্গে এগুলি খাপ খায় না।

মানবাধিকার অপরাধীর জন্যও মানবাধিকার; অভিযুক্তের জন্যও মানবাধিকার; সংখ্যালঘুর জন্যও মানবাধিকার; সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যও মানবাধিকার। রাষ্ট্রের কাজ অপরাধের বিচার করা;মানুষের মানবিক মর্যাদা কেড়ে নেওয়া নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় মানবাধিকার সংকট হয়তো এই নয় যে আমরা মানবাধিকার মানি না। সমস্যা আরও গভীরে। আমরা মানবাধিকারকে প্রায়ই নিজের লোকের জন্য অধিকার এবং অন্যের লোকের জন্য নীতিতে পরিণত করি।

সেখানেই গণতন্ত্র দুর্বল হয়।

সেখানেই সংখ্যালঘু অনিরাপদ হয়।

সেখানেই বিচার বিলম্বিত হয়ে শাস্তির রূপ নেয়।

আর সেখানেই রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নাগরিকের ওপরে উঠে যায়।

মানবাধিকারের প্রকৃত পরীক্ষা হল;আপনি যাকে পছন্দ করেন না, তার অধিকার রক্ষার জন্যও আপনি কি একই কণ্ঠে কথা বলতে পারেন ।

ব্রিকস সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী: মিলিত হলেন রাহুল গান্ধির সাথে, গান নৈশভোজে

শুভাশিস মজুমদার

‘গুরু, মিন্টাক ইজিন ন্যাইয়ি কেজাপ ওকে!’ মালয় ভাষায় সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রতি লিখেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, যার অর্থ মোটামুটি, ‘গুরু, একটু গান গাইতে পারি?’ সঙ্গে পোস্ট করেছেন একটি ভিডিও। যাতে দেখা যায়, তিনি গাইছেন ষাটের দশকের দশকের দুটি জনপ্রিয় হিন্দি গানের অংশ। ১৯৬৪ সালের সঙ্গম ছবির মুকেশের গাওয়া ‘দোস্ত দোস্ত না রাহা’ এবং ১৯৬৫ সালের তিন দেবীয়া ছবির কিশোর কুমারের গাওয়া ‘খোয়াব হো তুম ইয়া কোই হকিকত’ গান দুটি। গানের সাথে দেখা যাচ্ছে তাঁর বিশেষ শারীরিক ভঙ্গিমা। সঙ্গত করছেন এক পিয়ানো বাদক। উপভোগ করছেন উপস্থিত অনেকেই। স্থান, দিল্লিতে ব্রিকস এর নৈশভোজ।

সাধারণত রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক মানেই গুরুগম্ভীর আলোচনা, কূটনীতি আর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে সেই ছবিটা বদলে দিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অনোয়ার ইব্রাহিম। নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে নৈশভোজে যোগ দিয়ে মাইক্রোফোন হাতে তুলে নিয়ে গেয়ে ফেললেন মুকেশ ও কিশোর কুমারের জনপ্রিয় গান দুটি। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। বর্তমানে ৭৯ বছর বয়সের আনোয়ার ইব্রাহিম ষাটের দশকের শেষ ভাগে ছিলেন তরুণ। সেই সময়েই তাঁর ভারতের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি যে গভীর টান ছিল, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার, দিল্লিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রাতরাশ-বৈঠক করেন এবং ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকটিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদ্রও উপস্থিত ছিলেন। ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রাতরাশ-বৈঠকের সময়কার রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ছবি কংগ্রেস প্রকাশ করেছে। মোদী জমানায়, সাম্প্রতিক কালে দেখা গেছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র নেতাদের কূটনৈতিক সম্মেলনের কোনো বিশেষ ভোজ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় না। এই নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। কারণ, ভারতের ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক ও নজিরবিহীন। কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চান না যে রাহুল গান্ধি আন্তর্জাতিক বিদেশি নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। কারণ, মোদীজি ভয় পান।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র নেতাদেরও নিশ্চয় বিষয়টি নজর এড়ায় না। কারণ বিদেশের মাটিতেও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্মেলনের সময়ে সেই দেশের বিরোধী দল নেতাদের সাধারণত আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্য দেশের রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। যা এই মুহূর্তে ভারতে বিরল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, আনোয়ার ইব্রাহিম যে রাহুল গান্ধির সাথে মিলিত হয়ে বৈঠক করলেন এটা তাঁর সাহসীকতা, বিচক্ষণতা ও খোলা মনের পরিচয়।

হিন্দু গোষ্ঠীর পরিদর্শনের সময় নারী কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট, আইফেল টাওয়ার বন্ধ

রয়টার্স ও এএফপি
প্রকাশ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২ ৫০

ফ্রান্সের প্যারিসের আইফেল টাওয়ার। সোমবার সকালে সেখানে থাকা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল; কার্যক্রম পরিচালনাসংক্রান্ত কারণে আইফেল টাওয়ার খুলতে দেরি হচ্ছে। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

রয়টার্স

কর্মীদের ধর্মঘটের কারণে গত ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিখ্যাত স্থাপনা আইফেল টাওয়ার দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল।

একটি হিন্দুধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিদর্শনকালে আইফেল টাওয়ারের নারী কর্মীদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে সহকর্মীরা এই ধর্মঘট পালন করেন। কর্মী ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শনিবার হিন্দুধর্মীয় গোষ্ঠী বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার (বিএপিএস) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আইফেল টাওয়ার দেখতে যায়।

একই দিন এই আধ্যাত্মিক সংগঠনের উদ্যোগে সেন নদীতে একটি সাংস্কৃতিক নৌযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানায় এএফপি।

গত শনিবার হিন্দুধর্মীয় গোষ্ঠী বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার (বিএপিএস) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আইফেল টাওয়ার দেখতে যায়।

শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি দিয়েন দাভোয়েন রয়টার্সকে বলেন, প্রতিনিধিদলটি যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তখন নারী কর্মীদের তাঁদের কর্মস্থল ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, যাতে তাঁদের জায়গায় পুরুষেরা দায়িত্ব নিতে পারেন।

দিয়েন দাভোয়েন আরও বলেন, পরিস্থিতি নিয়ে সপ্তাহান্তজুড়ে উত্তেজনা বাড়ে। তাই গতকাল সকালে কর্মীরা বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেন। এর উদ্দেশ্য প্রথমত, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে যেন এই প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীদের আর কখনো এমন আচরণের শিকার হতে না হয়, তা নিশ্চিত করা।

এএফপি জানায়, পরে এক বিবৃতিতে আইফেল টাওয়ারের কর্মীরা ওই হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদলের পরিদর্শনকালে শুধু লিঙ্গগত কারণে নারী কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া, তাঁদের জায়গায় অন্যদের দায়িত্ব দেওয়া, তাঁদের (নারী কর্মী) আড়ালে রাখার পেশাগত নির্দেশনার নিন্দা জানান ।

এটি স্পষ্টতই গ্রহণযোগ্য আচরণ নয়। তিনি আবার স্পষ্ট করে বলছেন, আইফেল টাওয়ার কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নারী-পুরুষের সমতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

অ্যারিয়েল ওয়েইল, এসইটিইর প্রেসিডেন্ট

বিবৃতিতে বলা হয়, আইফেল টাওয়ারের নারী কর্মীদের এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নারী কর্মীদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, ওই প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানোর সময় তাঁরা যেন আড়ালে চলে যান। কয়েকজনকে তাঁদের কর্মস্থল ছেড়ে অন্য এলাকায় সরে যেতে বলা হয়েছিল। কর্মস্থলের কয়েকটি জায়গায় নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর প্রতিনিধিদলটি সেখানে অবস্থান করার সময় সব নারী কর্মীকে নির্দিষ্ট কিছু এলাকা দিয়ে যাতায়াত বা সেসব এলাকা অতিক্রম না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হওয়ায় কর্মীরা হতবাক হয়েছেন।

প্যারিসের এই বিখ্যাত স্থাপনাটির পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এসইটিই পরে বলেছে, হিন্দু প্রতিনিধিদলটি এমনভাবে এই পরিদর্শন আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছিল, যাতে তাদের সঙ্গে নারীদের যোগাযোগ সীমিত রাখা যায়। প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করেছে, তাদের এ ধরনের শর্ত মেনে নেওয়া উচিত হয়নি।

প্যারিসের এই বিখ্যাত স্থাপনাটির পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এসইটিই পরে বলেছে, হিন্দু প্রতিনিধিদলটি এমনভাবে এই পরিদর্শন আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছিল, যাতে তাদের সঙ্গে নারীদের যোগাযোগ সীমিত রাখা যায়। প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করেছে, তাদের এ ধরনের শর্ত মেনে নেওয়া উচিত হয়নি।

প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, এই শর্তগুলো এসইটিইর মূল্যবোধসহ নারী-পুরুষের সমতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এ ঘটনার 'পরিণতি' মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এসইটিইর প্রেসিডেন্ট অ্যারিয়েল ওয়েইল এএফপিকে বলেন, এটি স্পষ্টতই গ্রহণযোগ্য আচরণ নয়। তিনি আবার স্পষ্ট করে বলছেন, আইফেল টাওয়ার কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নারী-পুরুষের সমতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে প্যারিসের মেয়র এমানুয়েল গ্রেগোয়ার বলেন, এ ঘটনায় যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত শুরু করা হবে। কর্মীদের ক্ষোভের বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। তাঁদের অসন্তোষকে তিনি যৌক্তিক বলে মনে করেন।

গ্রেগোয়ার আরও লেখেন, এই প্রতিবাদের পেছনের ঘটনাগুলো সম্পর্কে দ্রুত পুরো সত্য উদ্‌ঘাটন করা জরুরি।

প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে অংশ নিতে বিএপিএসের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সে ছিলেন। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের প্রতিনিধিদলে সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল। এ কারণে অন্য দর্শনার্থীদের অসুবিধা এড়াতে আইফেল টাওয়ার খোলার সময়ের শুরুতেই এই পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের জানামতে, কোনো পর্যায়েই কাউকে আইফেল টাওয়ারে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়নি। তবু কারও মনে কষ্ট বা কোনো ধরনের অসুবিধা হয়ে থাকলে তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট ইয়ায়েল ব্রাউন-পিভে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'অন্যদের স্বাগত জানানো মানে কখনোই আমাদের মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়া নয়। ফ্রান্সে নারীরা জনজীবনে পুরোপুরি সক্রিয়। কেউ তাঁদের অদৃশ্য হয়ে যেতে বলতে পারে না।'

ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৭০ লাখ দর্শনার্থী আইফেল টাওয়ার দেখতে আসেন। গতকাল সারা দিনই আইফেল টাওয়ার বন্ধ ছিল। তবে এক কর্মী প্রতিনিধির ভাষ্য অনুযায়ী, আজ মঙ্গলবার এটি স্বাভাবিক নিয়মে খুলবে।

আইফেল টাওয়ারের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৭০ লাখ দর্শনার্থী স্থাপনাটি দেখতে আসেন। অন্যদের স্বাগত জানানো মানে কখনোই আমাদের মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়া নয়। ফ্রান্সে নারীরা জনজীবনে পুরোপুরি সক্রিয়। কেউ তাঁদের অদৃশ্য হয়ে

যেতে বলতে পারে না। ইয়ায়েল ব্রাউন-পিভে, ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট গতকাল সারা দিনই আইফেল টাওয়ার বন্ধ ছিল। তবে এক কর্মী প্রতিনিধির ভাষ্য অনুযায়ী, আজ এটি স্বাভাবিক নিয়মে খুলবে।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএপিএস ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ সংগঠন। প্যারিসের কাছে সংগঠনটি একটি বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। গত রোববার সেটির উদ্বোধন ছিল। আইফেল টাওয়ারের নিচে বিশাল এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়ান পর্যটকেরা।।

পরিবেশ ও প্রকৃতি

এলোমেলো কথা

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা : প্রকৃতি ও মানুষ

শুভ বসু

আমার শান্তিনিকেতনের জীবনের সব থেকে বড় শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা। সেই ছোটবেলাটা বলাই পড়েছি , তারপরে প্রকৃতি পাঠে শ্রেণী পাঠ করেছি , গাছের তলাতে পড়তাম, আমলকি আম, আমড়া সব ফলের সন্ধানে থাকতাম। আমার বন্ধু সন্দীপ মালহোত্রা একটি নিজের তৈরী করা মানচিত্র ছিল কার বাড়িতে আম পেকেছে তার। বৃষ্টির দিনে নদীর তীরে বেড়াতে গেছি তাতে অঘটন ঘটেছে। আবার সেখানে চড়ুইভাতি করে নির্মল আনন্দর সন্ধান পেয়েছি। পুরোনো শান্তিনিকেতনের কথা প্রমথ নাথ বিশির 'রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন'-এ পড়েছি। সেখানে শান্তিনিকেতনে বাঘ বের হবার গল্প রয়েছে। কিন্তু যত বড় হয়েছি তত এক দার্শনিক উপলদ্ধি গভীর হয়েছে মানুষের মধ্যে প্রকৃতি লুকিয়ে রয়েছে। প্রকৃতি মানুষ কে বাদ দিয়ে নিজের গতিতে বয়ে চলবে কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে কে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। মানুষ হলো প্রকৃতির সন্তান। তার প্রকৃতিকে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ভাবে , নান্দনিক ভাবে, জীবন অতিবাহিত করার জন্যে, জীবিকার জন্যে আবার দার্শনিক ভাবেও। দিগন্ত বিস্তৃত কাশের বনের আন্দোলিত রূপ দেখে আমার মনের মধ্যে সব সময়ে সীমা এবং অসীমের উপলদ্ধি হয়েছে। আমাদের জীবন কালের পঞ্জিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু প্রকৃতি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ফলে আমি প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের রূপ সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। বর্ষার শুরুতে বর্ষা মঙ্গল, শরতের শুরুতে শারদোৎসব, শীতের মধ্যে পৌষ উৎসব এবং মাঘোৎসব আবার বসন্তের অবগাহনে বসন্ত উৎসব এবং নব বর্ষের মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্ম কে বরণ করে নেওয়া। প্রকৃতি মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ক, আমাদের চারপাশের গাছ গাছালি, ঘাসের দেশ, ফুল ফল এবং নানাবিধ পাখি, পশু, কীট পতঙ্গ তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক তাকে যে রকম গান কবিতা ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে বুঝেছি আবার প্রকৃতিপাঠ জীবন বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়েও বুঝেছি। ইতিহাসে প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে নিউটনের প্রকৃতির নিয়মাবলী আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়াস করেছে। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসেছে , কানাডাতে বসে আমার , লেখা কেউ ভারতে কেউ বাংলাদেশে বসে পড়ছেন, কেউবা ব্রিটেনে পড়ছেন। আমরা এক একান্ত দ্রুত তথ্য, পুঁজি এবং স্বপ্ন বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি। কথা বলতে পারি দূরাভাষে প্রিয়জনের সঙ্গে ।

বর্তমানে তিনটি যুদ্ধ চলছে । একটি যুদ্ধ হলো পৃথিবীর তৈল সম্পদ কে নিয়ন্ত্রণ করবে, আর একটা যুদ্ধ হলো পৃথিবীর আব্রাহামিক ধর্মর সূচনার বাস ভূমি কে নিয়ন্ত্রন করবে, আর তৃতীয় যুদ্ধ হল রুশ দেশের পারিপার্শিক কে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রতিটি যুদ্ধর ভয়াবহতার সঙ্গে আমরা পরিচিত কাঙ্খা আমরা আমাদের কম্পিউটার চালিয়ে সেই যুদ্ধর ছবি দেখতে পাই। আমার মনের হয় রক্ত করবীর রাজা এবং খনির শ্রমিকদের মতো আমরা মুনাফার সন্ধানে বিযুক্তিবোধের শিকার হচ্ছি এবং আরো সংঘাতের পথে চলেছি । শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মধ্যে ধর্মর আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। আমাদের কৌম জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বেদান্ত দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা বৈতালিকে এবং সান্ধ্য উপাসনায় উপনিবেশদের মন্ত্র উচ্চারণ করি কিন্তু হিন্দু ধর্মর আনুষ্ঠানিকতা মানে পুরোহিত , ব্রাহ্মণ বা দেব দেবীর মূর্তির আরাধনা করি না । আমার মনে হয় উপাসনার মধ্যে দিয়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকৃতির যে রূপ তাকে আমরা অধ্যাত্মিক ভাবে কল্পনা করে নিতে পারি। শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে আমার এক ফরাসি বান্ধবী কেমব্রিজ থেকে এসেছিলেন এবং দুপুরে আমাদের বাড়িতে খেয়েছিলেন। আমায় প্রশ্ন করেছিলেন তোমরা তো ক্যাথলিক নয় কিন্তু তোমরা খ্রিস্টোৎসব করো কেন ? আমি বলেছিলাম আমরা তো ধর্মর অনুষ্ঠানিক দিকে বিশ্বাস করি না। আমরা ধর্মর মধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই। বাংলাদেশে অনেকে প্রশ্ন করেন আমাকে তোমরা বেদ মন্ত্র উচ্চারণ কর ? বেদান্ত এবং উপনিষদের মন্ত্র হিন্দু ধর্মর আকর। আমি তখন বলতাম তোমরা যদি বেদ কে এক প্রচলিত ধর্মর গ্রন্থ হিসাবে দেখো তাহলে নিশ্চই আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দুয়ানির ছাপ রয়েছে কিন্তু

তোমরা যদি ধর্মর বাইরে গিয়ে কোনো সামাজিক আনুষ্ঠানিকতাকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র মন্ত্র কে একটি আধ্যাত্মিকতার হিসাবে দেখো তাহলে তুমি মন্ত্রর পরিবর্তে মনের গহনে একটা ভোরের ফজরের আজান শুনতে পাবে।

আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ধর্ম নেই, আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ধর্ম রয়েছে যা মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের নির্দেশনামা। আমার বন্ধু শহিদুল আলম মঞ্জু গভীর ভাবে ইসলামে বিশ্বাস করেন। কিন্তু শান্তিকেতনে আমি যখন কোনো সুন্দরী নারীর মুখের কল্পনা করতাম মঞ্জু ধুতি পরে উপাসনা মন্দিরের মধ্যে তন্দ্গত চিত্তে উপনিষদের মন্ত্র শুনতো। আমাকে পরে সে বলেছে ওর মধ্যে সে সুফী মার্গের সাধনার পথের পদধ্বনি শুনতে পায়। প্রকৃতি ধর্ম মানবিকতা আর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা নিয়ে দু কথা লিখলাম। আসলে আমার নিজের ইতিহাস চর্চা নিয়ে নিজের ক্ষোভ রয়েছে। আমি রাজনীতির ইতিহাস লিখি। কিন্তু আমি যদি প্রকৃতি এবং সমাজের সম্পর্ক নিয়ে লিখতাম তাহলে নিজের ভালো লাগত। আমার ছোটবেলাতে কোনো নানাবিধ পশু পাখির গল্প পড়তাম বাঘ, সরাল এবং ঘড়িয়াল, কুমির , শুশুক, নানা ধরনের কাছিম এবং গোসাপ। কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সব নাগরিকরণের চাপে। তার একটি ইতিহাস লিখলে ভালো করতাম।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একটি বই আমার খুব প্রিয় ছিল Alfred W. Crosby. Ecological Imperialism- The Biological Expansion of Europe– 900-1900 - পরে সেই নিয়ে আলোচনা করা যাবে। দর্শনের দিক থেকে আমার প্রিয় লেখক হলেন আর্নস্ট ব্লখ। 'আশার নীতি' (জার্মান- Das Prinzip Hoffnung) হলো মার্ক্সবাদী দার্শনিক আর্নস্ট ব্লখের লেখা একটি বই, যা ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৯ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে লেখক শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যমে বিদ্যমান ইউটোপীয় প্রেরণাগুলো অধ্যয়ন করে ইউটোপীয়বাদ অন্বেষণ করেছেন এবং পরম পরিপূর্ণতার এক ভবিষ্যৎ অবস্থার কল্পনা করেছেন। 'আশার নীতি' খ্রিস্টান ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যকার সংলাপের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমার নিজের ধারণা বেদান্ত , সুফী দর্শন এবং রবীন্দ্র চিন্তা নিয়ে যদি মার্ক্সবাদী দৃষ্টি দিয়ে একটি আশার দর্শনের বই লিখতে পারতাম। এখন আমার মনে হয় ধর্ম , রাজনীতি এবং আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে যে বিভৎস রসের রাজনীতি ভারত এবং বাংলাদেশে চালু রয়েছে তা আমার জীবন দর্শন থেকে এতটা দূরের যে আমার মনে হয় আমি নিজেই বোধহয় , কুজ্ঝটীকাতে পথ হারিয়েছি। কোনো প্রকৃতি নন্দিনী কপালকুন্ডলার মতো কেউ নেই যে শুভ কে বলবে 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?' কিন্তু শুধুই কি অশুভ বিরাজমান ?

জাতীয় সংবাদ

ন্যারেটিভ থেকে নকল

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

'ন্যারেটিভ' শব্দটি নতুন নয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতীয় রাজনীতিতে শব্দটির ব্যবহার এতটাই বেড়েছে যে, এটি এখন রাজনৈতিক ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হয়ে উঠেছে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর থেকেই একটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল - সরকার অথবা শাসকদল একটি করে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি করবে, আর বিরোধী দল, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস, সেই ন্যারেটিভের জবাব দিতে ব্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করবে সরকার; বিরোধীরা সেই নির্ধারিত বিষয় নিয়েই প্রতিক্রিয়া জানাবে।

কিন্তু রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র পর থেকে সেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। এখন যেন উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে। রাহুল গান্ধি যে রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করছেন, যে ধরনের কর্মসূচি করছেন, যে ভাষায় সাধারণ মানুষ ও তরুণদের সঙ্গে কথা বলছেন, তার অনুকরণ করার প্রবণতা ক্রমশ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি দেশের চারটি শহরে রাহুল গান্ধি 'ছাত্র কি গুঞ্জ' কর্মসূচি করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, তাদের প্রশ্ন শোনা, তাদের নিজেদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া এবং সেই কথাগুলিকে জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসাই ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কর্মসূচিগুলির জনপ্রিয়তা চোখে পড়ার মতো।

তারপর দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও একই ধরনের কর্মসূচির পথে হাঁটছেন। দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে যে ধরনের যোগাযোগের সূচনা রাহুল গান্ধি করে চলেছেন, তারই অনুরূপ আবহ তৈরির চেষ্টা দেখা গেল দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হওয়া গুজরাটের বরোদার অনুষ্ঠানে। পদ্ধতি প্রায় একই - ছাত্রছাত্রী, মঞ্চ এবং বড় জমায়েত। প্রশ্নটা তাই স্বাভাবিক, এটা কি নিছক কাকতালীয়, নাকি রাজনৈতিক ন্যারেটিভের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ার প্রতিক্রিয়া ?

বহুদিন আগে একজন বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ এমন এক জায়গা যেখানে একদিকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর আর অন্যদিকে উষা উত্থুপের গানের অনুষ্ঠান হলেও দু'জায়গাতেই ভিড় হবে। মানুষের রুচি বহুমাত্রিক; ভিড় হলেই যে মানুষের মন জয় করা গেছে, এমন নয়।

আজকের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রবল সরকারি বাধা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধির 'ছাত্র কি গুঞ্জ' অনুষ্ঠানে ভিড় হয়েছে। আবার বিশেষভাবে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানেও ভিড় হয়েছে। তবে শুধু ভিড়ের সংখ্যা দিয়ে দুই অনুষ্ঠানের সাফল্য বিচার করা অর্থহীন।

আসল প্রশ্ন অন্য জায়গায়।

কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মনকে একাত্ম করতে পারছেন? রাহুল গান্ধির অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁরা প্রশ্ন করছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা বলছেন, কখনও সমালোচনাও করছেন। আর রাহুল গান্ধি তাঁদের কথা শুনছেন এবং সেই কথাগুলিকে নিজের বক্তব্যের অংশ করে নিচ্ছেন। তিনি যেন ছাত্রছাত্রীদের হয়ে কথা বলছেন না; বরং তাদের কথাকেই জাতীয় রাজনীতির ভাষায় তুলে ধরছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে কি একই সুযোগ রয়েছে?

ছাত্রছাত্রীরা কি একইভাবে নিজেদের মনের কথা বলতে পারছেন? তাঁদের প্রশ্ন কি একইভাবে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে আসছে? রাহুল গান্ধি যেভাবে তরুণদের উদ্বেগ, বেকারত্ব, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ এবং দেশের গণতন্ত্র নিয়ে তাঁদের মনের কথাগুলো নিজের ভাষায় প্রকাশ করছেন, প্রধানমন্ত্রী কি একইভাবে তাঁদের অনুভূতিকে নিজের বক্তব্যে প্রতিফলিত করতে পারছেন?

বরোদার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে কতটা ছাত্রছাত্রীদের মন ছুঁতে পেরেছেন, সেটাই আসল প্রশ্ন বা বিষয়।তবে এর থেকেও বড় একটি প্রশ্ন রয়েছে।

তেরো বছর ধরে দেশের সরকারে থাকার পরও একজন প্রধানমন্ত্রীকে কেন বিরোধী দলনেতার কর্মসূচি নকল করে তরুণদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে? তিনি তো তাঁর সরকারের সাফল্যের কথা বলতে পারেন। বলতে পারেন গত তেরো বছরে তার শাসনে দেশ কোথায় পৌঁছেছে। বলতে পারেন তাঁর সরকারের কোন কাজ তরুণদের জীবন বদলে দিয়েছে। বলতে পারেন কর্মসংস্থান, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের সাফল্যের কথা। কিন্তু যদি সেই আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে বারবার বিরোধী দলের কর্মসূচির অনুকরণ করতে হয় এবং বিরোধী দলের বক্তব্যের বিরোধিতা করেই রাজনৈতিক বক্তব্য তৈরি করতে হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই- তবে কি বলার মতো নিজস্ব কৃতিত্বের জায়গা ক্রমশ কমে আসছে?

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের এখনও প্রায় আড়াই বছর বাকি। অথচ এখন থেকেই যেন সেই নির্বাচনের সম্ভাব্য রাজনৈতিক ফলাফলের একটি আগাম ছবি তৈরি হতে শুরু করেছে। যে সরকার এতদিন ন্যারেটিভ তৈরি করত, সেই সরকার এখন অনেক সময় বিরোধী দলের তৈরি ন্যারেটিভের জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছে।

আর যে বিরোধী দল এতদিন সরকারের তৈরি ন্যারেটিভের উত্তর দিত, সেই বিরোধী দলের নেতা এখন নিজেই রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করছেন। অর্থাৎ, ন্যারেটিভের নিয়ন্ত্রণের জায়গাটাই যেন বদলে যাচ্ছে।

সরকারের প্রধান ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছেন, আর বিরোধী দলনেতা ক্রমশ সামনে এগিয়ে আসছেন, এমন একটি রাজনৈতিক ছবি এখন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

এটা ঠিক যে, শেষ পর্যন্ত জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যেন সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আচরণও কখনও কখনও মনে করিয়ে দিচ্ছে, তিনিও হয়তো বুঝতে পারছেন।

রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় শক্তি শুধু ক্ষমতায় থাকা নয়; মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়া।আর সেই জায়গাটিতেই হয়তো আজ সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি ঘটছে।

ন্যারেটিভ থেকে নকল- এই যাত্রাটাই হয়তো সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রমাণ।'

ইসরোর বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব নয়টি কর্মচারী সংগঠন

নাগরিক প্রতিবেদন : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ISRO) প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পরে মহাকাশ গবেষণার জন্য এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকে একদম শূন্য থেকে শুরু করে বিক্রম সারাভাই, সতীশ ধাওয়ান, এ পি জে আব্দুল কালাম, ইউ আর রাওয়ের মত বিদগ্ধ বিজ্ঞানীর হাত ধরে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান। কৃষি, যোগাযোগ,

আবহাওয়া, বনসংরক্ষণ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ইসরোর উপগ্রহগুলি থেকে পাঠানো তথ্য ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নে ও গবেষণায় একটা বড় অবদান রেখেছে। শুধু তাই নয়, এই উপগ্রহগুলি মহাকাশে উৎক্ষেপণের জন্য যে রকেটের প্রয়োজন হয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে সেই রকেট বানিয়ে ও তা দিয়ে উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছে। মাত্র কয়েকটি দেশই মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম। আর ভারত এই প্রযুক্তি অর্জন করেছে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায়। এখন প্রতি বছরই শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। বিভিন্ন দেশ তাতে জায়গা ভাড়া নিয়ে তাদের নিজস্ব উপগ্রহ পাঠায়। এইভাবে দেখতে গেলে বাণিজ্যিক দিক থেকেও ইসরো অনেকখানি সফল। সারা দেশে ইসরোর অনেকগুলি কেন্দ্র ছাড়িয়ে আছে। তাতে কর্মরত পনেরো হাজারের মত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। তাঁরা নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে উন্নততর উপগ্রহ ও রকেট বানিয়ে চলেছেন এবং তা থেকে পাঠানো তথ্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু গোল বাধলো কিছুদিন আগে। ২০২০ সালে ভারত সরকার তার মহাকাশ দপ্তরের অধীনে IN-স্পেস বলে একটি সংস্থা গঠন করে। তার উদ্দেশ্য ইসরোর সাথে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলির যোগসূত্র গড়ে তোলা, যাতে ভারতের মহাকাশ গবেষণার অর্জিত জ্ঞানের সুষ্ঠ বানিজ্যিক ব্যাবহার করা যায় । আর তার কর্ণধার পবন গোয়েঙ্কা গত ২১শে অগাস্ট ঘোষণা করলেন, এবার থেকে ইসরো আর তাদের উদ্ভাবিত রকেট তৈরি করবে না, উৎক্ষেপণও করবে না । বরং PSLV– GSLV– LVM ইত্যাদি উৎক্ষেপণ যন্ত্র, যা এতদিন ধরে পৃথিবীর কাছে ছিল ভারতের গর্ব, সেগুলির প্রযুক্তি বা বানানোর কলাকৌশল-সমস্ত বেসরকারি শিল্পের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেগুলি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বানিয়ে বাণিজ্য করবে। আর ইসরো মনোনিবেশ করবে শুধু নতুন নতুন গবেষণায়।

স্বাভাবিকভাবে ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা, যারা তিলতিল ধরে এতদিন সংস্থাটিকে গড়ে তুলেছেন এবং লালন করেছেন, এব্যাপারে প্রমাদ গুনছেন। নজিরবিহীনভাবে ইসরোর বিভিন্ন শাখার নয়টি কর্মচারী ইউনিয়নের তরফ থেকে ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণ - এর কাছে এক যৌথ চিঠিতে এব্যাপারে সরকারি নীতি কি তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, মহাকাশ দপ্তর থেকে এব্যাপারে কোনো সরকারি বিবৃতি এখনও দেওয়া হয় নি। আর এই নীতিগুলি কার্যকর হলে, এই সংস্থার ভবিষ্যৎ, সেই সাথে কর্মীদের নিয়োগ, চাকুরীর স্থায়িত্ব, বদলি, প্রমোশন ইত্যাদির কি হবে তা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলেছেন, উৎক্ষেপণ যন্ত্রের নকশা থেকে শুরু করে, তার নির্মাণ, নানা পরীক্ষানিরীক্ষা এবং সফল উৎক্ষেপণ - সমস্ত কিছু মিলিয়ে এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সামগ্রিক অর্জিত জ্ঞান। একে শুধু আর পাঁচটি উৎপাদন শিল্পের সাথে এক করে দেখা ঠিক হবে না। অন্যদিকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, এটাও কি আদানি-আম্বানির হাতে সফল সরকারি উদ্যোগগুলি তুলে দিতে আর এক নতুন প্রচেষ্টা ?

উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রেস কনফারেন্সের সময় যা কিছু ঘটেছে, তা আরও একবার গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার জবাবদিহিতার ওপর গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরেছে।

আলোচ্য বিষয়টি হলো, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনা থ নিজের বক্তব্য শেষ করে কোনও সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই যখন মঞ্চ থেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সাংবাদিক দিব্যা শ্রীবাস্তব অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে একটি তীব্র প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন যে, 'যখন প্রশ্নের উত্তরই দেবেন না, তখন প্রেস কনফারেন্স কেন করেন ?'

একজন নারী সাংবাদিকের দ্বারা ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির সামনে জনগণের অধিকারের জন্য এইভাবে নির্ভীকভাবে আওয়াজ তোলা সত্যিই প্রশংসনীয়, কারণ আজকের যুগে যখন অনেক সাংবাদিকই প্রশ্ন করতে ভয় পান, সেখানে দিব্যা কোনও ভয় ছাড়াই সাংবাদিকতার আসল ধর্ম পালন করেছেন।

অবশ্য, এই ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক তাঁকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিয়ে বিরোধী পক্ষ এটিকে সাংবাদিক হেনস্থা এবং ভয় দেখানোর চেষ্টা বলে অবিহিত করেছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক সূত্রগুলি এর সাফাই দিয়ে এটিকে কেবল ভিআইপি নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং সাধারণ নিয়মের অধীনে হওয়া একটি রুটিন আলোচনা বলে দাবি করেছে। যদিও কোনও অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপে দিব্যাকে তাঁর মিডিয়া হাউস বরখাস্ত করেছে । এদিকে তাঁকে ফোনে হুমকি দেও হচ্ছে ক্রমাগত ।

দাবি এবং প্রশাসনিক যুক্তির এই বিরোধের মাঝে, দিব্যা শ্রীবাস্তবের এই সাহসী পদক্ষেপ তাঁদের সবার জন্য একটি বড় দৃষ্টান্ত, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে সাংবাদিকতার আসল কাজ ক্ষমতার জয়গান গাওয়া নয়, বরং জনগণের পক্ষ থেকে কঠিন এবং জরুরি প্রশ্ন করা ।

fb তে লাইস আহমেদ মাজুম।

দিল্লি

নাগরিক প্রতিবেদন - অপরদিকে গত ৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তের সাংবাদিক সম্মেলনে দুইজন মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন এই অপরাধে (?) তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সাকেত পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে । যখন পুলিশ জানতে পারে তাঁদের নাম শাহিন খান ও নাফিসা খান এবং তাঁরা মুসলিম , তখন তাদের থানা লকআপে নিয়ে গিয়ে নির্মম ভাবে মারধর করা হয় । তাঁদের পানীয় জল দিতে পুলিশ অস্বীকার করে এবং ধর্ম তুলে গালিগালাজ করে।

যদিও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করে।সাংবাদিক দুজন তাদের মারধর করার চিহ্ন গুলি দেখান । পুলিশ বলে ওই সাংবাদিক দুজন ভিআইপি ট্রাফিক রুটে তাদের স্কুটি রেখে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছিল ।

পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে সাংবাদিক , নাগরিক , বিরাধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ওই থানার সামনে মধ্যরাত পর্যন্ত অবস্থান করেন।দোষী পুলিশদের বিরুদ্ধে এফআই আর দায়ের করার দাবি জানানো হয় ।

প্রেস ক্লাব , বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও সাংবাদিকরা অবিলম্বে সিসি টিভি ফুটেজ এর ভিত্তিতে তদন্তের দাবি জানিয়েছে ।

২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ; এ ভারতের স্থান বর্তমানে ১৮০ টি দেশের মধ্যে ১৬১ তম । এই সমীক্ষা করেছে ‘রিপোর্টার্স উইথআউট বর্ডারস‘ ।

২০২২ এ এই স্থান ছিল ১৫০। এই সংগঠনের মতে ভারতে সাংবাদিকদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটপূণ।

বাংলার মেয়ে আকৃতি চৌধুরীর মুক্তি, জেলা শাসকের জরিমানা

নাগরিক প্রতিবেদন : গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলা শাসক মেধা রূপমের নির্দেশে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী ও সমাজকর্মী আকৃতি চৌধুরীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়। আমাদের দুর্গাপুরের মেয়ে ও বঙ্গতনয়া আকৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নয়ডার আন্দোলনরত শ্রমিকদের সমর্থন করেছেন।

আকৃতি জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাই কোর্টে মামলা করেন। এলাহাবাদ হাই কোর্ট তাঁদের রায়ে আকৃতিকে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁরা গ্রেপ্তার করার পদ্ধতি নিয়ে জেলা শাসকের তীব্র সমালোচনা করেছেন। হাই কোর্ট জেলা শাসককে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন। এই টাকা তাঁকে নিজের বেতন থেকে দিতে হবে। প্রসঙ্গত যে জেলা শাসক মেধা রুপম চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা। তিনি হাই কোর্টের নির্দেশের বিরূদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছেন।

গৌতম বুদ্ধ নগরের আরও ঘটনা

জন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের সময় গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অক্ষয় ত্রিপাঠী তাঁর সহপাঠীদের যোগ দিতে প্ররোচিত করেছে এই অভিযোগে তবে তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিনের নোটিস পাঠান গ্রেটার নয়ডার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জেলা শাসক মেধা রূপমকে প্রশ্ন করেন। উত্তর প্রদেশ সরকার ওই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ড করে। জেলা প্রশাসন জানায় এই নোটিশের সঙ্গে জেলা শাসক মেধার কোনও সম্পর্ক নেই।ওই নোটিশ জারি করেছিল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পুলিশকর্তা কেননা গ্রেটার নয়ডা পুলিস কমিশনারেটের অধীনে। বিরোধীরা অভিযোগ করেছে জ্ঞানেশ কন্যা মেধাকে বাঁচাতে উত্তরপ্রদেশ সরকার এই কৌশল নিয়েছে । এলাহাবাদ হাই কোর্ট বলেছে তাঁদের পর্যবেক্ষণ মেধার সার্ভিস বুকে রেকর্ড করতে।

গত ৩ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে অভিযোগ ওঠে জন্তর মন্তরে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য এক কিশোরীকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তা শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন ‘এই ঘটনায় দোষীদের কাউকে বাঁচানো হবে না।’

প্রকাশিত হচ্ছে সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা

শুভাশিস মজুমদার

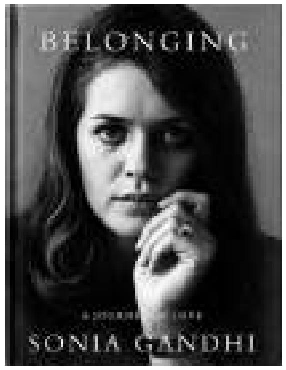

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' নিয়ে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে, হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা ১০ নভেম্বর ভারতে এই স্মৃতিকথাটি প্রকাশ করবে;যেদিন এর আন্তর্জাতিক সংস্করণটিও প্রকাশিত হবে।

লেখকের প্রতিনিধি এবং পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া (পিআরএইচআই)-র মধ্যে এক 'অচলবস্থা'র জেরে এর দেশীয় প্রকাশনার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনাটি একটি রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়; কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অশোক গেহলট ও কমল নাথ 'পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া'-র বিরুদ্ধে সরকারি চাপের কাছে নতিস্বীকারের অভিযোগ তোলেন। গেহলট অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং মোদী সরকারের আমলে ভারতের ভূখণ্ডে চীনের দখলদারিত্ব সংক্রান্ত অংশগুলোই বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে পিআরএইচআই কোনো ধরনের বাহ্যিক চাপের কথা অস্বীকার করেছে।

হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া এখন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায়, আলফ্রেড এ. নফ (পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউসের একটি ইমপ্রিন্ট)-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশের পাশাপাশি ১০ নভেম্বর ভারতেও 'বিলংগিং' বইটি প্রকাশিত হবে।

হার্পারকলিন্স কর্তৃক 'আমাদের সময়ের অন্যতম প্রতীক্ষিত রাজনৈতিক স্মৃতিকথা' হিসেবে অভিহিত এই বইটি মিসেস গান্ধির জীবনের একটি ব্যক্তিগত বয়ান এবং এতে ভারতের রাজনৈতিক যাত্রার এক অভ্যন্তরীণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

এই স্মৃতিকথাটি যুদ্ধ-পরবর্তী ইতালির ভেনেতো অঞ্চলে মিসেস গান্ধির শৈশব এবং কেমব্রিজে তাঁর পাড়ি জমানোর ঘটনা দিয়ে শুরু হয়; সেখানেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নাতি রাজীব গান্ধির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এতে রাজীব গান্ধির সাথে তাঁর বিবাহ এবং তাঁর শাশুড়ি তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সাথে পরিচিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, ভারতে নতুন জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নানা প্রচেষ্টার কথাও এতে বর্ণিত হয়েছে;যার মধ্যে রয়েছে হিন্দি ভাষা শেখা, শাড়ি পরা এবং ভারতীয় খাবার ও রীতিনীতির সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা।

স্মৃতিকথাটিতে গান্ধি পরিবারের ওপর গভীর প্রভাব ফেলা বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনার কথাও উঠে এসেছে; এর মধ্যে রয়েছে বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধির মৃত্যু এবং ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধি ও ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধির হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা।

বইটিতে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জোটের জয়ের প্রেক্ষাপট ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলিও তুলে ধরা হয়েছে। সেই জয়ের পর মিসেস গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ না করে কংগ্রেস ও 'ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স' (ইউপিএ)-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এই জোট টানা দশ বছর ক্ষমতায় ছিল।'

নাগরিক স্মৃতিচারণা

স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেত্রী লীলা নাগ (রায়)

বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লীলা নাগের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার পাঁচগাঁও- এ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মা কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী । তাঁর পিতৃ পরিবার ছিল তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার । বর্তমানে এই অঞ্চলটি মৌলভিবাজার জেলা হয়েছে ।

মৌলভীবাজার তথা তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার এক কৃতি সন্তান ছিলেন বিপ্লবী লীলা নাগ। ১৯২১ সালে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়ে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে পদ্মাবতী স্মৃতি পুরস্কারসহ বি.এ পাশ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন ও প্রথম হন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ছাত্রী । ১৯২১ সালে তিনি নিখিলবঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি গঠন করেন। ১৯২২ সালে তিনি ঢাকায় গঠিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতির সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ১২ জন সাথীকে নিয়ে নারীমঙ্গলের জন্য 'দীপালী সঙ্ঘ' গঠন করেন । তারপর নারী মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা মতন দীপালী সঙ্ঘের উদ্যোগে কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।

১৯২৫ সালে তিনি বিপ্লবী অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীসঙ্ঘ বিপ্লবী দলে যোগ দেন । ১৯২৬ সালে তিনি দীপালী ছাত্রী সঙ্ঘ (ভারতে প্রথম) নামক সংগঠন গড়ে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তাঁর ওপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৩০ সালে ঢাকায় তিনি মহিলাদের জন্য 'ছাত্রীআবাস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে তিনি 'জয়শ্রী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ওই ১৯৩১ সালেই তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে হিজলি বন্দি নিবাসে বন্দি করা হয় । হিজলি বন্দি নিবাসে নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পৃথক ব্যারাক ছিল। এই আট বছরের বন্দিজীবনে তাঁর সঙ্গে অনেকে কারাজীবন ভোগ করেছেন । যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমলা দাশগুপ্ত , কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) , কমলা চট্টোপাধ্যায়, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত (যোশি) প্রমুখ। সকলের স্মৃতিচারণেই উঠে এসেছে তাঁদের লীলাদির কথা ।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন ও লীলা রায়কে এই কমিটির নারী সংক্রান্ত মহিলা সাব কমিটির সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৩৯ সালের ১৩ মে বিপ্লবী অনিল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে তিনি এই সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন শুরু হলে তাতে যোগ তিনি গ্রেপ্তার হন। কারামুক্তির পর তিনি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড' সাপ্তাহিক সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নেতাজির অন্তর্ধানের পর তিনি ও অনিল রায় উত্তর ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন । ১৯৪২ এর মার্চ মাসে তিনি আবারও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ এর অক্টোবরে নোয়াখালির দাঙ্গার পর তিনি দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণকার্যের জন্য নোয়াখালি যান ।গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয় । তিনি ত্রাণকার্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন ।

ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট নামে সেবাদল গঠন করে সেবা ও শান্তির কাজে নিযুক্ত থাকেন । তিনি সংবিধান প্রণয়নকারী গণ পরিষদের সদস্য ছিলেন ও সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন । তিনি ও অনিল রায় দেশভাগের বিরোধিতা করে ঢাকায় থাকেন । কিন্তু দলের সংগঠনের দায়িত্ব পড়ায় ভারতে চলে আসেন ও উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ।প্রজা সোসালিস্ট পার্টি গঠিত হলে তিনি এই দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের প্রথম মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি ।সমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষাবিস্তার ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ।ঢাকা শহরে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ।আরও দুটি স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ।

তাঁর আদি বাড়ি ছিল বর্তমান মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায়। ১৯৪৭সনে দেশ ভাগ হলে তিনি অবশেষে ভারতে চলে যান ।যতদিন বাংলাদেশে ছিলেন ততদিন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

তাঁরা ভারতে চলে গেলে তাঁদের পৈতৃক বাড়িটি বেদখল হয়ে যায়। সেই বাড়িটি উদ্ধার করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির উদ্যোগে বাড়িটি উদ্ধার করা হয়। কমিটির নাম লীলা নাগ স্মৃতি পরিষদ।

সেই কমিটির সবাই মিলে বাড়িটি উদ্ধারের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। মৌলভীবাজারের অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষও সেই উদ্যোগে সহযোগিতা করেন। আদালতের রায়ে বাড়িটি উদ্ধার হয়। এখন বাড়িটিতে কি করা যায় তা নিয়ে মৌলভীবাজারের সুধিজন একটি কমিটি গঠন করেছেন। মৌলভীবাজারের সবাই চেষ্টা করছেন যাতে এই জেলার কৃতিসন্তানের বাড়িটি জনকল্যাণের জন্য কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে জেলার মানুষকে সম্পৃক্ত করে সবাই মিলে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

২০০৮ সালের ৮ ডিসেম্বর তৎকালীন ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি , প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং লোকসভায় বিরোধীদলের নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি সংসদের সেন্ট্রাল হলে লীলা রায়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনের সময় উপস্থিত ছিলেন । ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের একটি পরীক্ষা হলের নামকরণ করা হয় লীলা নাগের নামে।

১৯৭০ সালের ১১ জুন এই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর আগে তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে ২৯ মাস সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন ।

আলোর দিশারী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন প্রশাসন সংশোধনী বিল আনা হল

অমিতাভ সিংহ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে যেভাবে সমস্ত বিরোধী দল, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে চলেছেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি এই ধরনের রুচিহীন হুমকি ও আক্রমণ অতীতে কেউ কখনও শুনেছেন বলে জানা যায়না। বর্তমানে তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।গত ৯ সেপ্টেম্বর তিনি গেরুয়া পতাকার মর্যাদা রক্ষার কথা ঘোষণা করে গোল পার্ক থেকে যাদবপুর ৮ বি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি মিছিল করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে গৈরিক পতাকার মর্যাদা হানি করল সেটাই বোঝা গেলনা । কোনও সংবাদপত্র ২০ আগস্ট মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আক্রমণ ও অগ্নি সংযোগকে 'গেরুয়া তাণ্ডব' বলে অভিহিত করে । এর দায়িত্ব কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বর্তায় ? যাই হোক ৯ সেপ্টেম্বর - এর মিছিলে গেরুয়াধারী সন্নাসী , মাঝবয়সী লোক, নাগা সন্নাসীদের উপস্থিত করানো হয় । ছাত্রদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য । মুখ্যমন্ত্রী নাগা সন্ন্যাসীদের নিয়ে মিছিল করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন । তাতে গৈরিক রং যা ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক তার সন্মান বৃদ্ধি পায় নি । বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস আমলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বার বার সরকারের বিরোধিতা করলেও ওই সময় রাজ্য সরকার কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই ভাবে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেননি ।

এই দিন তাঁরভাষণে মুখ্যমন্ত্রী উৎকর্ষের কেন্দ্র , ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিধন্য যাদবপুর বিসবিদ্যালয়ের মাটি থেকে তথাকথিত আজাদি গ্যাং , যাঁরা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি - কিযেনজি লাল সেলাম - মুক্ত কর প্যালেস্টাইন এই সব স্লোগান দেয় তাদের উপরে ফেলবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন স্বামী বিবেকানন্দ , শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামী প্রণবানন্দের মাটি এই পশ্চিমবঙ্গ । আধ্যাত্মিক জাগরণের এই ভূমিতে গেরুয়া নিয়ে কোনও অসন্মানজনক উক্তি করা বা লেখার আগে পাঁচবার ভাবতে হবে বলে তিনি সতর্ক করে দেন ।

মুখ্যমন্ত্রী জানান আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন এমেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ হতে পারে। তিনি বলেন এটি একটি ঐতিহাসিক বিল। এই বিল অনুসারে রাজ্য সরকার যেকোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যেকোন জায়গায় বদলি করতে পারবে। এই আইনের লক্ষ যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্যাঁচে ফেলতে ও দেশের শ্রেষ্ঠ দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটির তকমা পাওয়া প্রতিষ্ঠানের গরিমাকে ধুলিস্মাত করে দেওয়ার চক্রান্ত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ একটাই, এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্ন করতে শেখায়। বিভিন্ন মতবাদের শিক্ষক ও ছাত্র থাকলেও দিনের শেষে তারা প্রত্যেকে তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই মূলেই কুঠারাঘাত করে তা নির্মূল করতে চেয়েছে। এবং তাতে সলতে পাকানো শুরু হয় সপ্তাহ তিনেক আগে ঘটে যাওয়া মধ্যরাত্রের তান্ডব থেকে। এটি যে পরিকল্পিত ছিল, চিত্রনাট্যের নিয়ম মেনে, তা এখন বোঝা গেল।

একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি প্রবল অসূয়াবোধ ও তার ওপর প্রতিশোধস্পৃহা, রাজ্যে সরকার যে সমগ্র শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার পরিসরটিকে লন্ডভন্ড করে পৈশাচিক আনন্দ পেতে চাইছে তার উদাহরণ সারা দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না,এমনকি উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্যেও। আসলে কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'বিরাট ম্যানডেট' শব্দবন্ধটি উচ্চারিত হওয়াটা ক্রনোলজি বা প্রেক্ষিতটি বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু বিরাট জয় কি যা খুশী করার ছাড়পত্র দেয়? মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন রাজ্য সরকার দিলেও তারা কেউই সরকারি কর্মচারী নন। তাদের নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার বা কলেজ সার্ভিস কমিশনের মত কেউ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে বিধানসভায় আইন গৃহীত হওয়ার মধ্যে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা আইন ও স্ট্যাটিউট আছে।তাদের চাকুরি সংক্রান্ত নিয়ম বা সার্ভিস রুল আলাদা। নিজস্ব সেনেট, সিন্ডিকেট,কোর্ট আছে যেখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার।তাতে বদলির কোন সুযোগ নেই যেমন আছে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ওয়েস্টবেঙ্গল সার্ভিস রুল অনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী, পাঠক্রম অনুযায়ী সেই নিয়োগ সম্পন্ন হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন 'আমাদের নতুন তৈরী হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তথাকথিত পন্ডিতদের পাঠাব। তারা দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটু শক্তিশালী করে দিয়ে আসবেন।' পড়াশোনা করা শিক্ষিত সমাজের ওপর তার এত রাগ কেন? দেশের

প্রধানমন্ত্রীসহ নিজে বা বেশীরভাগ বিজোপি নেতার শিক্ষার সমস্যা আছে বলে? তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করতে গিয়ে সমাজবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন,এটা তো পুরোপুরি অনভিপ্রেত।আমাদের দেশ সংবিধান অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ । তাকে ব্যঙ্গ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা তো সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসাবে দেশের সংবিধানকে ছোট করা। নিজেই সংবিধানকে ব্যঙ্গের দ্বারা বিদ্রুপ করে প্রকারান্তরে বিরুদ্ধাচারণ করলেন। এরপর ছাত্র শিক্ষকদের দেশদ্রোহীর তকমা দিচ্ছেন? নিজে কি বুঝতে পারছেন না কি বলছেন,কি করছেন?

বহু শিক্ষক আছেন যাদবপুরে যারা বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আইআইটি ছেড়ে এখানে এসেছেন পড়াবেন বা গবেষণায় সহায়তা করবেন বলে। তখন তো বদলির শর্ত ছিল না।তাহলে আজ তাদের যেকোনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইলে তারা যাবেন কেন? তাছাড়া তাতে যেমন যাদবপুরের ছাত্র বা গবেষকদের ক্ষতি হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানেরও অপূরনীয় ক্ষতি হবে।একটি উচ্চমেধা সম্পন্ন শিক্ষকেরও অপমৃত্যু ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী কি এটাই চান? বাংলাকে সর্বক্ষেত্রে দেশের শেষ সারিতে নিয়ে যেতে? একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা ফ্যাকাল্টি কেড়ে নেওয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার নামান্তর।

মনে রাখতে হবে এইধরনের বদলির নিয়ম দেশের কোন রাজ্যে নেই।এমনকি অসম, মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশেও।

একটি প্রতিষ্ঠান দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে তার পরিচালন দক্ষতার জন্য। সেখানকার উৎসর্গীকৃত শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য। প্রাক্তন ছাত্রদের আর্থিক সহায়তাও ভূমিকা পালন করে যেমনটি যাদবপুরের ক্ষেত্রে হয়। বহু অধ্যাপক তাদের নিজেদের যোগাযোগ ও প্রয়াসের ফলে দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রোজেক্টের জন্য অর্থ নিয়ে আসেন। এর ফলে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা গবেষণা করার সুযোগ পায়। আবার পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে গবেষকদের শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে হয় বহুসময়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব আছে তিনি তা বলেছেন। তাহলে সরকার কেন সেগুলিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেবেন না।এটাই তো সহজ পথ।ভ বাংলায় তো মেধার অভাব নেই। অথচ এই বিলটি মাত্র কয়েক মিনিট নোটিশে ও আলোচনার সুযোগ না দিয়ে অতি দ্রুত পাশ করানো হল,কেন? সরকারের তো বিধানসভায় বিশাল সংখ্যক বিধায়ক রয়েছে।যে কোন সময়ে যেকোন বিল পাশ করানো তো এখন জলভাত। আসলে পেশীর জোর দেখানোটাই উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোটাতেই এদের এক অদ্ভুত আনন্দ। শিক্ষায় সংস্কার করতে হলে একটা বিতর্ক যেমন দরকার,তেমনি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করটাও জরুরি। এটাই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পথ। যার শিকড়টি পড়ে আছে শিক্ষায় নিরন্তর উন্নয়ন বা কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট সূত্রের মধ্যে। কিন্তু যদি কারও মধ্যে সেই বোধের বদলে তা ধ্বংস করার বাসনা থাকে ও শিক্ষিত সমাজকে মাথা তুলতে না দেওয়া তাহলে এটাই তোএটাই সহজ ও সেরা রাস্তা।এধরণের রাস্তা একদা হিটলারও নিয়েছিলেন বলে জানি।পরিণতিও সবার জানা। শুভেন্দুবাবুরা ইতিহাস পড়েন নি বলেই হয়তো এই পথে হাঁটছেন। ইশ্বর তাঁ কে রক্ষা করুন।'

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সংকট কাটছে না

মজিবুর রহমান

একটা কথা প্রায়ই বলা হয়--'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব মুক্তি ঘটায়।' কিন্তু সুবিধাপ্রাপ্তদের (প্রিভিলেজড) কাছে সাধারণ মানুষের মুক্তি কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। কারণ, সাধারণ মানুষের চেতনার উন্মেষে সুবিধাপ্রাপ্তরা সমস্যায় পড়ে। শিক্ষিত মানুষের চাহিদা বেশি। অশিক্ষিত মানুষ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাই শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে একটা অনাগ্রহ কাজ করে। তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে পাঠক্রমকে নিজেদের ভাবানুসারী করে সাজাতে। পাঠক্রমে অবৈজ্ঞানিক, অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, সেকেলে চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে। আর, চেষ্টা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ, খবরদারি ও দখলদারিত্ব কায়েম করতে। উল্লেখ্য, বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর লোকেদেরই মূলত সুবিধাপ্রাপ্ত বলে ধরা হয়। শিক্ষার প্রতি সরকার বা শাসকের মনোভাব বোঝাতে রুশ মনীষী লিও টলস্টয়(১৮২৮-১৯১০) বলেছেন,'জনগণের অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। সরকার সেটা জানে এবং সেজন্য সে জ্ঞানচর্চার বিরোধিতা করে।' সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে রাজার নির্দেশে উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বইপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, রাজার আশঙ্কা ছিল--'ওরা (প্রজারা) যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে।'তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজার পক্ষ

থেকে প্রচার করা হয়— 'লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে।' ব্রিটিশ সরকার সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য ভারতীয়দের যতটুকু লেখাপড়া শেখানোর দরকার ছিল সেটুকুর ব্যবস্থাই করেছিল। সেজন্য ব্রিটিশদের প্রায় দুশো বছরের শাসন শেষে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। স্বাধীন ভারতের বয়স আশি বছর হয়ে গেল। কিন্তু সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশও হয়নি! অনেক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। ভালো ভালো সুপারিশ জমা পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ভালো ভাবে কার্যকর করা হয়নি। শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ যতটা হওয়া উচিত তা কখনও করা হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু ভারতে উল্টোটা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে দেশে প্রায় ৯৪ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ বা একীভূত (মার্জড) হয়েছে। গড়ে দৈনিক ২৫টি স্কুলের এই পরিণতি ঘটেছে। প্রথম শ্রেণিতে যতজন পড়ুয়া ভর্তি হয় তার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মাধ্যমিকের আঙ্গিনায় পৌঁছায় না। শেষ পর্যন্ত স্নাতক হয় ১০ শতাংশের মতো। পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। নতুন স্কুল খোলার বদলে প্রতি বছর কিছু স্কুল শিক্ষার্থীর অভাবে উঠে যাচ্ছে। পূর্বোক্ত ৯৪ হাজারের মধ্যে এরাজ্যের স্কুল রয়েছে ৮ হাজার। সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়া ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে।

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৮০০ স্কুলকে সংস্কার করে পি.এম.শ্রী স্কুল করা হবে।আধুনিক মানে উন্নীত করার এই প্রকল্পের খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। এছড়া এখন প্রতি জেলায় ২ টি করে সি.এম.শ্রী স্কুল করা হবে। এগুলি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নবোদয় বিদ্যালয়ের আদলে । প্রশ্ন উঠেছে ,যেখানে রাজ্যের হাজার হাজার স্কুলে পরিকাঠামো নড়বড়ে , শিক্ষক নেই বহু স্কুলে সেখানে সামান্য কটি স্কুল সংস্কার করে কি আদৌ কোনও মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে? শিক্ষার সংকোচন ও মানের অবনমন উচ্চ শিক্ষার ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইদানিং কলেজ ইউনিভার্সিটির আসন সংখ্যা পূরণ হচ্ছে না। যাদের পড়াশোনা করার কথা তারা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। আসলে কেন্দ্রীয় এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির অন্যতম অভিমুখ হল শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং সস্তা শ্রমিক সৃষ্টি করা। সেজন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পড়ুয়াদের জন্য প্রকল্প রয়েছে; কিন্তু পড়াশোনার পরিবেশ নেই। শিক্ষা বহির্ভূত কাজ বেড়েই চলেছে। স্কুলগুলো তথাকথিত সরকারি প্রকল্প রূপায়ণ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। লেখাপড়া বাদ দিয়ে ওই সব করে দিন কাটছে। এডমিশান, রেজিস্ট্রেশন, এগজামিনেশ হলেই হল! এডুকেশন বাদ থাকলে থাক! এই হচ্ছে পরিস্থিতি। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কোথাও পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নেই। এখন চাকরিতে জয়েন করার চেয়ে চাকরিচ্যুত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে। নিয়োগ সং ক্রান্ত ব্যাপারে সব জায়গাতেই জট পাকিয়ে রাখা হয়েছে। সময় এগিয়ে চলে, সরকার বদল হয় কিন্তু জট খোলে না। আন্দোলন অব্যাহত থাকে।আদালতের আঙ্গিনায় কোনো সমাধান পাওয়া যায় না।

বর্তমান রাজ্য সরকার আগের সরকারের মতোই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব কায়েম করতে চাইছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতি গঠন বন্ধ হয়ে রয়েছে। ইউনিভার্সিটির স্বশাসনের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। মুক্তচিন্তার চর্চার ঐতিহ্য বহনকারী ও পড়াশোনায় উচ্চ গুণমান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করা হচ্ছে। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে নজিরবিহীন ভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের বদলি করার সংস্থান রেখে বিল পাস করা হয়েছে। বার্তা স্পষ্ট, সরকার বা শাসকদলের বিরোধিতা করা চলবে না; করলে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের পানিশমেন্ট ট্রান্সফার পেতে হবে। শাসকদলের সাংসদ-বিধায়ক ও অন্যান্য নেতানেত্রী বিভিন্ন কলেজের গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হচ্ছেন। প্রিন্সিপালরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না।প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের সিলেবাসে অনেক বদল ঘটতে চলেছে। দলীয় ধারণার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত আখ্যান নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন করে কাউকে 'হিরো' অথবা কাউকে 'ভিলেন' বানানো হবে।সাহিত্যের মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িকতায় শান দেওয়া হবে। বিতর্কিত লেখাগুলো বাড়তি গুরুত্ব পাবে। বিজ্ঞানের যে অধ্যায়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘাত আছে, সেই অধ্যায় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়বে। শিক্ষার্থীরা যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বদলে বিশ্বাসনির্ভর শিক্ষা লাভ করবে। সরকার একদিকে বলছে 'মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' মাদ্রাসা তুলে দেওয়া হবে; অন্যদিকে 'হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বিদ্যাভারতী বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা ঘোষণা করছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনো সরকার কি এমন পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপ করতে পারে ? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পাঠক্রম

ধর্মভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার পাঠ দেওয়ার সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক বিষয় পড়ানোর কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের পথ ধরলে ভারতের লাভ হবে না। শিক্ষা সমাজকে আলোকিত করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে পড়ে শিক্ষার আলোক বিচ্ছুরণের ক্ষমতা নষ্ট হয়। ছুরি দিয়ে ফল কাটলে ঠিক আছে, কিন্তু ছুরি দিয়ে মানুষকে আঘাত করলে অনর্থ ঘটে। তবে এটাও ঠিক মানুষকে রক্তাক্ত করার ঘটনা ছুরির স্বাভাবিক কর্ম নয়। ওটা একটি ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা। শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে সত্যকেই উন্মোচন করে। শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ চিনতেও সাহায্য করে। শিক্ষা সংকট থেকে উত্তরণের পথও দেখায়।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

দেশে খাদ্যাভ্যাস বদলে হিন্দুত্ববাদী অপচেষ্টা !

উদ্দালোক শর্মা

সম্প্রতি কলকাতায় এসে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ওরফে বাগেশ্বর বাবার প্রকাশ্যে দুর্গাপূজার সময়ে বাঙালিদের নিরামিষ খাওয়ার নিদান এবং আমিষাশী (মাছ মাংস খাওয়া) বাঙালিদের পাখণ্ডী (ভন্ড বা কপট) বলে উল্লেখ করায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কংগ্রেস নেতা অতনু দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বাঙালিদের নিয়ে কটু ভাষা প্রয়োগ ও দুর্গাপুজোর সময় মাছ-মাংস না খাওয়ার নিদান দিয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও তাঁর ছবি পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ অতনুকে গ্রেফতার করে। পুলিশ থানায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো দুই কংগ্রেস নেতা প্রদীপ প্রসাদ ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে। জেলার এক কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে খবর। গ্রেফতারের চারদিন পরে অতনু দাস জামিন পান। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা থেকে এই প্রতিবাদীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন পুলিশকে। অথচ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে এফআইআর করা হয়েছিল তার উপর কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে কোনো খবর নেই।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর উক্তি ও তার প্রতিবাদে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, একদিকে ড্যামেজ কন্ট্রোল এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থে উগ্র হিন্দুত্ববাদ দেখাতে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করে যাচ্ছেন বিজেপির নেতা, বিধায়করা। সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রের সমীক্ষার সরকারি তথ্য জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ৯৯ শতাংশ মানুষ আমিষাশী।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিতর্ক থামার আগেই খবর এলো, প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে এই প্রথম ভারতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতাদের নিয়ে কোনো সম্মেলনে শুধু মাত্র নিরামিষ পদ পরিবেশন করা হল। ইরান, সৌদি আরব, ইথিওপিয়া, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, রাশিয়ার মত দেশের আমিষাশী রাষ্টনেতাদের, এবং প্রতিনিধি সহ সরকারি আমলা, সাংবাদিক সকলের জন্য ব্রিকস সম্মেলনে ব্যবস্থা ছিল শুধু মাত্র বিভিন্ন নিরামিষ আহারের। নিরামিষ পদের মতই আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রকারের আমিষ খাবার পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত। আমাদের দেশের আশি শতাংশ মানুষ আমিষাশী বলে উল্লেখ করে রাহুল গান্ধি বিজেপির এই জোর করে খাদ্যাভ্যাস বদলে দেওয়ার প্রবণতার, সামাজিক মাধ্যমে কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বিরোধ করেছেন।

প্রাক্তন আমলা ও সাংসদ জহর সরকার বলেছেন, ২০১০ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সম্মানে দেওয়া ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নৈশ ভোজের আয়োজনে ছিল সুস্বাদু নিরামিষ ও আমিষ পদের সুন্দর সমন্বয়। সাম্প্রতিক ব্রিকসের অতিথিদের মতই ২০১০ এর ওই নৈশ ভোজের অধিকাংশ অতিথি ছিলেন আমিষ ভোজী।)

স্মরণ

কেতকী কুশারী ডাইসন

কেতকী কুশারী ডাইসন (২৬ জুন ১৯৪০ ; ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬) ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কবি, ঔপন্যাসিক, লেখিকা, অনুবাদক ও গবেষক। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করতেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি লিখেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা বিষয়ক গবেষণা ও অনুবাদকর্মের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন।

জীবন ও কর্ম পিতা অবনীমোহন কুশারী এবং মাতা অমিতা কুশারীর সংসারে কলকাতায় ১৯৪০ সালের ২৬ জুন তাঁর জন্ম হয়। তবে শৈশব কেটেছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) মেহেরপুরে। সে সময়ে (১৯৪২-৪৫) তার পিতা মেহেরপুর মহকুমার মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে রেকর্ড নম্বর পেয়ে তিনি বি.এ পাস করেন। ১৯৬৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন।

জন্মসূত্রে তার নাম কেতকী কুশারী বোস। রর্বাট ডাইসনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ডাইসন পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন।তাঁর প্রথম পুত্র ভার্জিল পূজারী ডাইসন ১৯৬৭ সালে এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইগোর নীলাদ্রি ডাইসন ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করে।

তাঁর সাহিত্যিক জীবন প্রোজ্জ্বল। তাঁর আত্মপ্রকাশ কবি হিসেবে হলেও সাহিত্যের নানা মহলে তার পদচারণা ছিল। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও লিখেছেন কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ। অনুবাদ করেছেন। তার নারী, নগরী কলকাতার ১৯৬৫ সালে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি এই আত্মজীবনীমূলক রচনাটি লিখেছিলেন। ১৯৮১ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস নোটন নোটন পায়রাগুলি রচনার সময় তিনি একটি ইংরাজি প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম "Towards a Multi-Dimensional Women's Movement"। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বল্কল'। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছয়টি। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'। এটি একটি নারীবাদী উপন্যাস। এ বইয়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'এই উপন্যাসে... সত্তরের দশকের নারী-আন্দোলনের ফসল ঘরে আনা হয়েছে' । তাঁর রচিত রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে একটি জনপ্রিয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ। (তথ্য সূত্র- উইকিপিডিয়া)

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক সুরেশ কুন্ডু

চলে গেলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ও দেহদান চক্ষুদান আন্দোলনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের সম্পাদক সুরেশ কুন্ডু। সোমবার অধিক রাতে তিনি মারা যান। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে দান করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞান আন্দোলনে কর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে সুরেশ দার সঙ্গে আমার ও তহমীনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তহমীনার জীবন সংগ্রাম নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও প্রথম গ্রন্থ 'রণক্ষেত্রে তহমীনা একা' গ্রন্থটি সুরেশ দা লিখেছিলেন। তহমীনার মৃত্যুর পর গ্রন্থটির পরিমার্জিত পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি সবে দু সপ্তাহ পর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। খবরটি পেলাম সাথী অপূর্ব সাহার মাধ্যমে। অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ন মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর সময় পরিবারে রেখে গেলেন স্ত্রী এক পুত্র এক কন্যা ও জামাতা পুত্রবধূ নাতি-নাতনি। তার মৃত্যু এই দুঃসময় 'নাধার্মিক আন্দোলন' মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমরা হারালাম এক নিষ্ঠাবান সাথীকে যা এক অপূরণীয় ক্ষতি। স্যালুট অকুতোভয় সুরেশ দা কে। অনেক কথাই মনে পড়ে এই পরিস্থিতিতে কি আর লিখব। আপনারা যারা সম্ভব সুরেশদার স্মরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

—সমব্যথী সাথী সুকুমার মিত্র

প্রাক্তন শিক্ষক নেতা (বিপিটিএ) কৃষ্ণ দাস

একদা শিক্ষক নেতা ও লেখক কৃষ্ণ দাস, বাম রাজনীতিতে সিপিআই, পরে ইউসিপিআই দলে ছিলেন। বাংলাদেশের ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ কৃষ্ণ দাস চাকদায় উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং প্রাথমিক স্কুল সংগঠন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে কারাবাসও করেছেন।

তাঁর লেখা বই 'চাকদায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার দিনগুলি', ভিতেরত্তরাঙাত্তইটগুলি এবং গোটা দেশের নানা জায়গায় পূর্ব বঙ্গের ছিন্নমূল মানুষরা কি অপরিসীম বঞ্চনা ও হেনস্থা সহ্য করে নাগরিকত্বের লড়াই লড়ছেন, সে বিষয়ে বই প্রকাশ করেছে জনস্বার্থত্তপ্রকাশন। তার ফেসবুক পেজে ২৭/০৬/৩০২৬ লিখেছেন রামমন্দিরে রাম নাই, জানে তীর্থের সম্পাদক সম্পত সাধু সন্ত পুরোহিতেরাই খায় সব ভক্তদের দেওয়া টাকা মধু।

খবরে প্রকাশ, খণ্ডিত স্বাধীনতার কারণে ছিন্নমূল মানুষদের লড়াইয়ের অন্যতম নেতা ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসেই প্রয়াত হয়েছেন। জনস্বার্থত্তবার্তা ও জনস্বার্থত্তপ্রকাশন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

—কল্যাণ মুখার্জী ।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন — শুভেন্দু দাশগুপ্ত

জম্মু ও কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক
ফিল্ম ফেস্টিভাল।
৭–১০ সেপ্টেম্বর
জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম ফিল্ম
ফেস্টিভাল,
শুধু সিনেমা দেখানোই নয়,
মাস্টার ক্লাস, সেমিনার,
প্যানেল ডিসকাশন।
মাস্টার ক্লাস নিতে গিয়েছিলেন
অশোক বিশ্বনাথন, বিধু বিনোদ
চোপড়া, ইমতিয়াজ আলি —
সিনেমা জগতের নামকরা লোকেরা।
ইমতিয়াজ বলেছেন — 'এখনই
বিশ্বজুড়েই এক কঠিন পরিস্থিতির
মধ্যে দিয়েই এগোচ্ছি আমরা।
সেই জায়গাতে এই ধরনের
উদ্যোগই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে
সাহায্য করবে।

এই সময়, ১৩ সেপ্টেম্বর
২০২৬

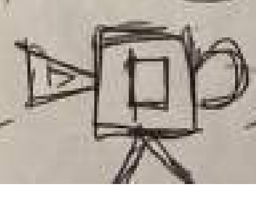

ব্রিকস সম্মেলন।
খবরের কাগজে
প্রকাশিত ছবিতে
প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদির দুপাশে
দাঁড়িয়ে ইসলামি
ধর্মী আবু ধাবির
ক্রাউন প্রিন্স শেখ
খালেদ বিন মহম্মদ
বিন জায়েদ আল
নাহিয়ান, মিশরের
প্রেসিডেন্ট আবদেল
ফাত্তাহ আল
সিসি, ইরানের
প্রেসিডেন্ট মাসুদ
পেজেশকিয়ান,
ইথিওপিয়ার
প্রধান মন্ত্রী
আবি আহমেদ
আলি।

সংবাদ প্রতিদিন
১৩ সেপ্টেম্বর
২০২৬

২

অঞ্জন দত্তর
গান

পারিনি শেখাতে তোকে
সত্যি বলো কথা কোনো/
গাইতে একটা সত্যি বলা
গান/ পারিনি শেখাতে
তোকে ঈশ্বর আল্লা একই
ভালবাসার নাম/ পারিনি
আমি, আমি পারিনি
পারিনি পারিনি।

রোববার, প্রতিদিন,
৬/৯/২০২৫

বনবাদাড় ঘেরা
ভালকীতে মা শিবাখ্যার
পুজোর সঙ্গেই যেন কোথাও
ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে
হুসেন শাহ নির্মিত একটি
মসজিদ। ইতিহাস ও স্মৃতির
ঝাঁপি খুলে বসলে
জ্ঞানাকির রক্ত দাপাদাপি
করে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দের
মায়াবী আলো।
পূর্ব বর্ধমানের অজয়
ও কুনুর নদীর
অববাহিকায় আউশ
গ্রামের ভালকী
অরণ্য ভূমিতে ঘেরা,
এখনও সেখানে দেবীর
পুজো হয়। আবারও
দেবী শিবাখ্যা।
অনেকেই মনে করেন
— তেপিনি বুড়ের
ভূতুড়ে কাহিনীর
জনপদ কল্যাণীর মুখে
উল্লেখিত শ্বেতক
নগরীর কালের নিয়মে
বিবর্তিত হয়ে 'সুয়াতো'
হয়েছে। একসময়
নরবলি হতো, তা
বন্ধ করেন সৈয়দাতার
বাহরামি পির —
সুদূর আরবের
ইয়েমেন প্রদেশ থেকে
আসা সুফি সাধক,
যিনি ছিলেন শাহী
আউশগ্রামের কাছে

৩

সুয়াতায়, পির ছিলেন
শাহ জামালের কয়েক
জন সঙ্গীর রক্তে
স্নান ভরা। সে সময়
সুয়াতা ছিল গোপ
রাজাদের হাতে। রাজারা
ছিলেন গোবিন্দ প্রতাপ।
শিবাখ্যার পূজোয়
গোপরাজাদের যে
নরবলি প্রথা ছিল তার
জন্য তার নিজস্ব বাহিনী
ছিল। রহমানি পীর
এই নরহত্যার ঘটনার
প্রতিবাদ করায় রাজার
সঙ্গে তার সংঘাত
অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তার
পাশে এসে দাঁড়ান সুফি
সাধকদের এক দল,
মাহমুদের অনুগামী হন তিনি
সহ বাহিনী। শুরু হয়
[illegible], লড়াই — খবির
ভাণ্ডার লড়াই, লড়াই
হয়েছিল সুয়াতা থেকে
৪/৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে
প্রতাপপুরের কাছে। লড়াইয়ে
রহমানি পীর তার সঙ্গীপাশে

সহ নিহত হন। যুদ্ধের
পর শহীদদের দেহগুলি
নিয়ে এসে এই
সুয়াতা গ্রামেই সমাহিত
করা হয়, বহু শহীদের
সমাধিস্থল হয়তো বা
শুহাদাই বলার
প্রচলন হয়। দীর্ঘ
৮০০ বছরের ব্যবধানে
'শহাদাই' শব্দটি
রূপান্তরিত হয়ে
যুক্ত শুহাদাই > শুহাদ >
সহাদা > সুয়াতায়
পরিণত হয়েছে।
পীর রহমানির একটি
প্রাচীন মাজার পুকুরও
রয়েছে সুয়াতা গ্রামের
বাইরে।
সুয়াতার পুরনো দিনের
বিখ্যাত কবি আবুল
খলিল ছিলেন
সুলতানি হুসেন শাহের
(১৪৯৩ – ১৫১৯)
সমকালীন। হুসেন
শাহের নির্দেশে

১৪৩৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১৪
খ্রিষ্টাব্দে 'মৃগাবতী' নামের
একটি কাব্য রচনা করেন
তিনি। সেই কাব্যে উল্লেখ
পাওয়া যায় —
গোপভূম নামে দেশ অতি পুরাতন
কত গোপ বাস করে মনে দিয়া মন
অজয় কুনুর নদী গোপভূম ভিতর
এর মাঝে আছে কত সুন্দর শহর।

বাংলার নবাব হুসেন শাহ ছিলেন
বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতি মনস্ক,
উদার প্রকৃতি, তাঁর সমকালে
একটি চলতি প্রবাদ পাওয়া
যায় —
'বাদশা ছিলেন হুসেন শাহ
জাতিতে পাঠান
ছিল তার পারিষদ
উজির দেওয়ান'
৩০০ বছর আগে ১৭২৩
খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়ার মধ্য
সায়রের দিগম্বর দাস
তাঁর 'মঙ্গল কাব্য'য় পীর
পয়গম্বরের বন্দনা প্রসঙ্গে
এখানকার বাংলার শাহের
উল্লেখ করে লিখেছেন —

সংহতির বন্দনী
বন্দো দেলুয়ার পী[র]
বদর খানের বন্দো
সাগরে মন্দির //
বিভেদের মাঝে ঐক্যের
সুর শোনা যায়
চণ্ডীমঙ্গলের তৃতীয়
দেবীর আরাধনা চলে
পীরের মাজারে দেওয়া
হয় ধূপ একই
সময়।
মুসলমান নারীরা
এখনও শরৎ সকালে
আঁচলে শিউলি
নিয়ে বসে দিয়ে
যান দেবতার থালায়
এর মাঝেই জেগে
থাকে যা লিখেছি তার
মালিক।
অরবাগের খরানা দেবী
রবিবারের রংদল, চুকি,
প্রতিদিন, রবিবার.
৬/৯/২৬